KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ সরকার মার্কেট প্লেস, কল ১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 11/4 12/2 12/3 12/4	Year of Publication : Oct 1988 May 1989 July 1989 July-Sep 1989
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ সংখ্যা ৪৪

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৯৬

সূচি

আলোচনা : প্রসঙ্গ বাবর । দেবীপদ ভট্টাচার্য ১
স্বখনের ঘর দুয়ার । কানাই কুণ্ডু ৫
দু'শ বছর আগে ভারতে ফরাসি কবি । নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৬
নৌকাবিলাস । সুনীল দাশ ২২
গান আমার । পিনাকী ভাদুড়ী ৩০
আবার যদি ইচ্ছা কর । মীণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ৩৮

ক্রোড়পত্র : শতবর্ষে নরেন্দ্র দেব

'ভারতী' পত্রিকা ও নরেন্দ্র দেব । অলোক রায় ৪৭
মানুষ গড়ার পাঠশালা ও নরেন্দ্র দেব । শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬
রাজমধ্যবর্তিন নরেন্দ্র দেব । স্বপন মজুমদার ৬৮
নরেন্দ্র দেবের সিনেমা-ভাবনা । ধ্রুব গুপ্ত ৭৬

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

অরূপ দত্ত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত ও শিকদার প্রিন্টার্স-এর সহযোগীতায় টেকনোপ্রিন্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

প্রতিবারই নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন সরকার। অধিকাংশ ঘোষণাই উচ্চানাদী ও উৎসাহসঞ্চারী। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে অচিরেই দেখা যায় তাদের অধিকাংশ ঘোষণাই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। বেকারদের জন্য নেহেরুর নামে কর্ম-প্রকল্প হোক বা রাতারাতি রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতমনস্ক হয়ে উঠুন—এগুলো ভারতেরমূল রাজনৈতিক সমস্যাগুলি থেকে আমাদের মুখ কিছুদিনের জন্য ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু না। সাধারণ মানুষের উপকারের প্রয়াস নিশ্চিত অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু সেই উপকার কে কিভাবে কখন করবে, কার হাতে থাকবে সাহায্য সম্প্রদানের ক্ষমতা—এই নিয়ে যখন বিতণ্ডা শুরু হয় তখন উদ্দেশ্যর সততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতেই পারে।

এদেশে সরকারি বাজেট পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় পরিকল্পনা-বহির্ভূত বিষয়গুলিতেই বরাদ্দ ধরা হয় বেশি। নির্বাচনের কথা মনে রেখে এবারের বাজেট তো পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতেই সিংহভাগ খরচ ধরা হয়েছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম আপাতদৃষ্টিতে বাড়ানো না হলেও পরিবহন খরচ এতটাই বাড়ানো হয়েছে যে পরোক্ষে সব জিনিসের দাম বাড়তে বাধ্য। কাগজের দামও বেড়েছে অনেকটাই। এভাবে কাগজের দাম বাড়লে আমরা যারা যৎসামান্য সম্বল ও অসামান্য উৎসাহে কাগজ প্রকাশ করে থাকি, আর কতদিন কাগজ প্রকাশ করতে পারবো জানি না! ছোট ছোট কাগজগুলিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও ডি. এ. ভি. পি ও অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলি ছোট কাগজের জন্য গঠনমূলক কিছুই করেননি। নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়লে বড় কাগজগুলির দাম বাড়ে, বিজ্ঞাপনের হার বাড়ে, অথচ রাজনীতির বাইরে থাকা সাহিত্য সংস্কৃতিমনস্ক কাগজগুলি, যেখানে জাতির মূল চরিত্র লক্ষণ স্পষ্ট হয়, তাদের উপকারের জন্য দীর্ঘস্থায়ী কিছু করা হয় না!

এ বছর নরেন্দ্র দেবের শতবার্ষিকীর বছর। সাহিত্য অকাদেমী এই উপলক্ষে একটি অভিনন্দনীয় স্মরণসভার আয়োজন করেছিলেন। ঐ সভায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য বিভাব সম্পাদকমণ্ডলীর হয়েছিল। সুলিখিত ও প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি নিবন্ধ সেখানে পঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলিতে শুধু নরেন্দ্র দেবই নন, তাঁকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বঙ্গ সংস্কৃতি সমাজের একটি স্মরণীয় চিত্রও উদ্ভাসিত হয়েছিল। আত্মপ্রচারবিমুখ নরেন্দ্র দেবের অনেক অন্যপূর্ব আকর্ষণীয় দিকও নতুনভাবে আমাদের গোচরে এসেছিল। সাহিত্য অকাদেমীর আঞ্চলিক অধিকর্তা নির্মলকান্তি ভট্টাচার্যকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

বিভাবের পরম সুহৃদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। প্রকাশের শুরু থেকেই বিভাবের প্রতি ছিল তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা ও আশীর্বাদ। তাঁর সর্বশেষ রচনাটি তিনি বিভাবকেই দিয়ে গেছেন। এই সংখ্যায় তা মুদ্রিত হলো। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

আলোচনা : প্রসঙ্গ বাবর

দেবীপদ ভট্টাচার্য

"Rejecting counsel to offer Kohinur for pious uses, he resolved to supplicate for the acceptance of his life. He made intercession through a saint his daughter names, and moved thrice round Humayun's bed, Praying, in effect, O God ! If a life may be exchanged for a life. I, who am Babur, give my life and my being for Humayun. During the rite fever surged over him and, convinced that his prayer and offering had prevailed, he cried out. "I have borne it away ! I have borne it away !" Gulbadan says that he himself fell ill on that very day, while Humayun poured water on his head, came out and gave audience."—

Babur Nama (Memoirs of Babur)

Translated from the original Turki Text

Zahiruddin Muhammad

Babur padshah Gazi.

Translated by A. S. Beveridge

(Vol. I & II in one format) page 701-702.

আমাদের পুরাণে এমন অনেক কাহিনী আছে যেখানে স্বামী পত্নীকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে পাবার জন্য নিজের অর্ধ আয়ু প্রদানে দৃঢ় সংকল্প, বা রাজা সোমক নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাঁর রাজ-পুরোহিত ঋত্বিককে নরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে নিজের পুণ্যের অর্ধাংশ দান করে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, সেই নরক-যন্ত্রণার অংশ নিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নরকবাস'-এর

রাজা সোমক মহাভারতে বর্ণিত চরিত্রের চেয়ে মহত্তর সৃষ্টি—রাজা নিজে 'অন্তর নরকানলে' নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেও স্বয়ং ধর্ম তাঁকে নিতে এলে তিনি পুরোহিত ঋত্বিকের কাতর আবেদনের প্রত্যুত্তরে বলেছেন—

ভগবন,
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে করো মোর যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির স্বর্গে প্রবেশ করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের না দেখে বলেছিলেন 'আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন, সেই আমার স্বর্গ।' তখন তাঁর নরক দর্শন হয়। সেই তমসাবৃত, পূতিগন্ধময় নরকে পত্নী, ভ্রাতা, কর্ণ প্রভৃতির আহ্বানে দুঃখার্ত হয়ে দেবদূতকে বললেন: 'আমি ফিরে যাব না, এইখানেই থাকব, আমাকে পেয়ে আমার দুঃখার্ত ভ্রাতারা সুখী হয়েছেন।

পুরাণকে যদিচ শাস্ত্রকারেরা 'ইতিহাস' বলেছেন কিন্তু যে-অর্থে এখন আমরা History বলি খাঁটি পুরাণগুলি সেই পর্যায়ের নয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন, কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের কথা মনে রেখেই একথা বলছি। আলবেরুণী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ও অধ্যয়নে যে ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন, তার ফসল তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে সঞ্চিত হয়ে আছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি, বা একদেশদর্শিতার নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তবকাৎ-ই-নাসিরি, তারিখ-ই ফীরুজশাহী, বাহিরিস্তান্ বা রিয়াজ-উল-সালাতিন্ প্রভৃতিকে ইতিহাসের মর্যাদা দিতে হবে। তেমনি মোগল সম্রাটদের নিয়ে প্রস্তুত 'বাবরনামা' বা 'আকবরনামা'র মতো গ্রন্থ অশেষ মূল্যবান বই। বাবর পুত্র হুমায়ুনের আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় খোদাতালার কাছে আবেদন করেছিলেন যে, তার অব্যয়িত আয়ু যেন পুত্র হুমায়ুনকে দান করতে পারেন, যার ফলে তাঁর মুমূর্ষু পুত্র ফিরে পাবে জীবনযৌবন। আর তিনি চলে যাবেন তাঁর প্রার্থিত বেহেস্তে। এই বর্ণনা এত সুন্দর, করুণ ও মহৎ যে এর তুলনা পৃথিবীতে বেশি নেই।

হঠাৎ সেদিন ঔপন্যাসিক গ্রেহাম গ্রীনের 'The Quiet American' বইটি হাতে পড়ল পুরোনো বই গোছাতে গিয়ে। গ্রীনের শেষের দিকের বইগুলি আমেরিকার অজগরী পররাষ্ট্রনীতি, ভিয়েতনাম নীতির তীব্র বিরোধী। সকলেই জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) জাপানের পরাজয়ের পর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ

পুনরায় তার প্রভুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিল আমেরিকার উৎসাহে ও প্রশ্রয়ে ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-লাওস অঞ্চলে। জেনারেল গিয়াপ 'দিয়েনবিয়েন ফু'র ঐতিহাসিক পতন ঘটান।

কিন্তু ঐ যুদ্ধের ইতিহাস লেখা আমার অভিপ্রেত নয়। ঐ বইটিতে যুদ্ধের রিপোর্টার হয়ে এসেছিলেন একজন ইংরেজ সাংবাদিক গ্রানগার। সেই যুদ্ধের ভয়াবহ নৃশংস পটভূমিকায় সেই স্বজনহীন রিপোর্টার ভাবছে নিজের অসুস্থ পুত্রের কথা। সে বলেছে ফরাসী পাইলটকে, যে বোমা ফেলছে নিজেরই শৈশব পালিত গ্রামে—দুঃসহ অনুতাপে।

গ্রান্‌গার: "My son's got polio. He is bad."
ফরাসী পাইলট: "I am sorry."
গ্রান্‌গার: "I don't mind if he is crippled, Fowler.
Not if he lives, Me, I'd be no good
Crippled, but he had got brains. Do
You know, what I have been doing in
There while that bastard was singing ?
I was praying. *I thought may be if*
God wanted a life he could take mine (p. 240)

ঈশ্বর, প্রাণ যদি নিতেই চান তাহলে তো তিনি আমারটাই নিন্ না কেন! এর মধ্যে কি বাবরের সেই প্রার্থনাই শোনা যাচ্ছে না?

সুদূর কালের মোগল বংশের স্থাপয়িতা দুর্ধর্ষ বাবর গভীর অপত্য প্রেমে যে-প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন সে প্রার্থনা কি হারিয়ে যায়? না যায় না, অন্তরের গভীর গহনে সে প্রার্থনা জেগে থাকে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র সবার আমলে।

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শঙ্খ ঘোষ 'কবিতার মুহূর্ত' নামে একটি স্মরণীয় বই বার করেছেন। এরই অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রবাদ-প্রতিম কবিতা 'বাবরের প্রার্থনা'। 'শেষ হয়ে আসছে ১৯৭৪। বড়ো মেয়েটি বেশ অসুস্থ তখন, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটা ঠিক কোথায়। শুয়ে আছে অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে। অথচ তার ফুটে উঠবার বয়স। মন্থর হয়ে আছে মনটা।' কিন্তু এইটুকু হলে কবিতাটি ইতিহাসের রুগ্ন হুমায়ুনের কাহিনীর ম্লান ছায়া হয়ে থাকত।

কবিতাটির পরিধি, মাত্রা, গভীরতা, যন্ত্রণা আমাদের, পাঠকদের মর্মমূলকে এমন নিবিড়ভাবে স্পর্শ করত না। মনে রাখি সেটা ১৯৭৪, 'মুক্তির দশক' আর ১৯৭২-এর পর থেকে সেই মুক্তির স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও দুরন্ত প্রয়াসকে টুঁটি চেপে, রক্তগঙ্গা বইয়ে ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে রক্তমাখা দেহগুলিকে গঙ্গার ঘাটে ঢেলে ফেলে দেওয়ার ঘৃণ্য ইতিহাস। বিপ্লবী তরুণদের সেই বিবর্ণ মুখচ্ছবি, রোগশ্রান্ত কন্যার পাণ্ডুর মুখের সঙ্গে কখন এসে মিলে যায়। তখনই শঙ্কর মনে হয় "মাটির ওপর জানু পেতে বসে পড়ি একবার এই সূর্যের সামনে, কেউ তো নেই কোথাও! যেন সমস্ত শরীর ভরে উদ্‌গত হয়ে উঠতে চায় অতল থেকে কোনো প্রার্থনা; **সকলের জন্য**। মনে এল নামাজের ছবি। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে এল ইতিহাসের পুরোনো সেই গল্প রুগ্ন হুমায়ুনকে ঘিরে বাবরের প্রার্থনা :—

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

সুখনের ঘর দুয়ার

কানাই কুণ্ডু

প্রায় দু হাত উঁচু মাটির দেওয়াল। ওপরটা গম্বুজাকৃতি। জংলি লতাপাতার ছাউনি। নিচু হয়ে ঢুকে ভেতরে দাঁড়ানো যায় টান-টান। ফোকর বলতে ওই ঢোকার দরজা। দরজায় শালকাঠের পুরু ওজনদার পাল্লা। জংলি লতায় বাঁধা দুটো খাটিয়া এক কোণে পাতা। তার ওপর খেজুর পাতার চাটাই। অন্যদিকে দুটো হাঁড়ি, লাল মাটির রঙ। একটায় জল। অন্যটা প্রতিদিনের রান্নার কালিতে আচ্ছন্ন। মাটির দুটো ডেকচির অবস্থাও প্রায় তাই, তবে তৈলাক্ত। ওতেই ভাজাভুজি, সেদ্ধ, চচ্চড়ি—সব। একটা টিনের কৌটো, মুখটা গোল করে কাটা। এক কোনা থেকে অন্য কোনায় ঝোলানো দড়ি। তাতে কয়েকটা রঙিন কাপড়, বিবর্ণ। সঠিক রঙ বোঝা যায় না। একটা তালপাতার পেটি। তার মধ্যে জংলি ক্ষারে কাচা কিছু কাপড়চোপড়, তিনটে দশ টাকার নোট, একটা প্লাস্টিকের চিরুনি, রঙিন কাঁচের চুড়ি এবং সীসা-দস্তা-রুপো মেশানো ধাতুর বাজু, কানের ফুল; যা ছত্তিশগড়ে জলডার গহনা নামে প্রচলিত।

পাশাপাশি দুই গ্রাম—বরন্দালি আর শিলতোড়া। মাঝখানে ছোটো জঙ্গল, ফুলঝোরিয়া। ফুলঝোরিয়ায় ফুল নেই। শাল-সেগুন-গরানের ঘন ছায়া। পাতার ফাঁকে দুপুরের রোদ ঝিকমিক করে। পাখি গান গায়। খরগোশ, কাঠবেড়ালি লাফিয়ে বেড়ায়। দূরের অরণ্য থেকে পথভোলা হরিণের পাল থমকে দাঁড়ায়। ফুলঝোরিয়ার শাল সেগুনের ফাঁক দিয়ে এপার ওপার ঘরবাড়ি দেখা যায়। এ গাঁয়ের বাউড়ির মন আনচান করে। হাতের কাজ ভুলে বাপের ঘরের স্মৃতিচারণ করে।

সুখনের গেরস্থালি বরন্দালি গ্রামে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে মসৃণ দাড়ি গোঁফ। স্বাস্থ্যবান যুবা পুরুষ। শরীরে বন্য পশুর তাগদ। মাঝে মাঝে মাথার চুল সামলাতে কপালের ওপর লাল পাড়ের চওড়া ফেট্টি বাঁধে। সে এই গ্রামের ভৈঁসাচরোইয়া। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, সুখনলাল। বরন্দালি গাঁওকে

রহনেওয়ালা। দাদাকে (বাবার) নাম মোতিলাল। সে ফুলঝোরিয়ায়, দূরের পাহাড়তলিতে, জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে ওঠা ঘাসের বনে গোরু-ভৈঁসা চরায়। টিনের কৌটোয় বানানো ঘণ্টি গোরু-ভৈঁসার গলায় বাঁধা থাকে। চলার ছন্দে, মাথা নাড়ায় ঘণ্টি বাজে খড়র খড়র। সুখন কোনো গাছের ছায়ায় অথবা পাহাড়ের খাঁজে বসে থাকে। মাঝে মাঝে দূরগামী গোরু-ভৈঁসার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে, হো লালী···ই···ই, হো কালুয়া···আ···আ, ঠাহর যা। গোরু ভৈঁসারা কখনো কথা শোনে, কখনো বা সুখন ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে যায়। বেয়াড়া ভৈঁসাকে পিটিয়ে দলের মাঝে পাঠায়। বেলা বাড়ে। সুখনের মনে নানা কথা ভিড় করে। হারিয়ে-যাওয়া ছেলেবেলা, বাপের উদ্দাম স্নেহ, অনেক দিনের পুরনো খেই-হারানো কথা অথবা মুঙ্গলিকে মনে পড়ে।

শিলতোড়া গ্রামের মুঙ্গলির ওমর তখন ছ বরষ। বরন্দালি থেকে বরাত এল। সুখন বর। তার বাপের মহা উৎসাহ। দু বোরা চাওল মুঙ্গলির বাপের ঘরে ফেলে সশব্দে হেসে উঠল, হামার একৈচ টুরা হে, সুখন। দিনভর খানাপিনা হোহি। সুখনের বয়স তখন দশ। সব কথা তার ভালো মনে নেই। তবে খুব হৈ-হল্লা হয়েছিল। তার বাপ মহুয়া খেয়ে, মুঙ্গলিকে কোলে তুলে নেচেছিল। মুঙ্গলির তখন কি কান্না! থামানো যায় না। এগারো বছর পরে গাউনা হলো। মুঙ্গলিকে তখন চেনাই যায় না। সাদির দিনেও সুখন দেখেছে, মুঙ্গলির নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। এখন কেন্দু ফুলের মতো গোরা-গোরা মুখ। ফুলে-ওঠা গাল। চোখ দুটো শুখা নালার গহ্বর পানি। প্যাঁচানো শাড়িতে ঢাকা শরীরটায় পাহাড়ি ঢাল। মুগ্ধ বিস্ময়ে সুখন মুঙ্গলিকে দেখছিল। তার যেন আর দেরি সইছিল না। সেদিন থেকেই তারা একত্রে বসবাস করবে, সারাটা জীবন। সুখনের বুকের ভেতর আনন্দের উথাল-পাথাল ঢেউ।

সুখনের মা ছিল না। বাপ খেতমজুর। গাঁয়ের জোতদার পেয়ারীলালের জমিতে পেটভাতায় কাজ করে। ফসল উঠলে একবোরা ধান পায়। অভাবের সংসার। ঘর বলতে পাতায় ছাওয়া ছোটো ঝোপড়ি। সন্ধ্যা হতেই বাপ বলল, তুমন এতি নিদ যাহ। হাম মালিককে ঘরমে যাওঁম। অবসে হম ওতি রহে যাই।

রাত্রে কুপির আলোয় সুখন মুঙ্গলিকে আবিষ্কার করে। কখনো মনে হয়, থমকে-থাকা ঢেউ খেলানো নদী। কখনো বা নীল আশমানের চাঁদনী। মুগ্ধ

বিস্ময়ে সে মুঙ্গলির শরীর দেখছিল। মুঙ্গলি লজ্জা পায়। বলে, বাত্তি বুতা দে। শরম লাগমে মোলা। সুখন কুপিটা আরও কাছে আনে। মুঙ্গলির শরম দেখে। চোখের কোণে তৃপ্তির উচ্ছল আভাস দেখে। মুঙ্গলি ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। তখন ঝোপড়ি, আসবাব, দূরের অরণ্যে পাখির ডাক, পাহাড়ি ঝরনার শব্দ অদৃশ্য হয়ে যায়। কেবল মুঙ্গলি আর সুখন। এক অনাস্বাদিত আনন্দে তারা আবিষ্ট রাত ভোর করে দেয়।

কত রাত্রি এই নিবিড় আচ্ছন্নতায় কেটে গেল। মাঝে মাঝে বাপ এসে সুখনকে তাড়া দিত, অব ডণ্ডকা (যুবক) বনে তুম। ডণ্ডকী ভি ঘরমে আয়ি হে। কাজ কাম কর। একবোরা ধানসে ভুখ না মিটহি। কাপড়া লাও। চাহি। কাল হামার সঙ্গ চলিহ। মালিককে জমিনমে কাম লাগা দিই। ভাত মিলহি, একবোরা ধান ভি মিলহি। ধান বেচকর কাপড়া, চুড়ি খরিদ লিহ।

সুখন পালিয়ে বেড়াত। পাকের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিনরাত জমিনের কাম তার ভালো লাগত না। মালিকের ব্যবহারও তার একদম পসন্দ্ হয় না। দুনিয়ার সব মানুষকে নোকর মনে করে। ওর কাছে কাম করবে না সুখন। বাপ গুসা করে। একদিন তো মুঙ্গলির সামনেই তাকে এক ঝাপড়া মেরেছিল। সুখনের অভিমান হল। দিনভর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে মুঙ্গলির জন্য তার কষ্ট হল। আহা, বেচারি সবে নতুন শ্বশুরালে এসেছে। যদি রাতে ডর লাগে, কেঁদে ওঠে! তাড়াতাড়ি ঝোপড়িতে ফিরে এল। দেখে বাপ বাইরে বসে আছে। বাপের জন্যও দিলটায় দুখ লাগে। বাপের পায়ের কাছে বসে পড়ে। বাপ সস্নেহে সুখনের মাথায় হাত বুলায়। বলে, কাম নেহি করনেসে, ই দুনিয়ামে মাঙ্গনি ভাত কোন দিহি টুরা। মুঙ্গলিকো ভি দুখ পঁহুছি। তু কাম কর। মুঙ্গলি ভি ধান উথাড়নে কা কাম করহি। তো তোর দিন গুজর যাহি। হম তো অব মানে কা ওয়াস্তা মে হে। বুঢ়াপা আ গয়ে। নজর ছোটা হো গিসে। হামার আশ ছোড় দে টুরা।

সুখন কেঁদে ফেলে। কথা বলতে পারে না। বাপ তার দুঃখ বুঝতে পারে। একটা চুটি জালিয়ে ধোঁয়া ছড়ায়। উঠে বলে, ঝিন (না) শোচিহ টুরা। সব ঠিক হো যাহি। যাও আব তুমন খানা খাকে নিদ যাহ। হাম যাওঁম।

অন্ধকারে হারানো বাপের শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা করে, কাল সকালেই মালিকের নোকরি নিয়ে নেবে।

এই তার তকদির। তাদের মতো মানুষেরা গোলামির জন্যই জন্মায়। আশপাশের সবকটা ঝোপড়ির মানুষ তাই করে। সে একা এই নিয়ম ভেঙে দাঁড়াবার হিম্মত কোথায় পাবে। নিজেকে বাঁচতে হবে, মুঙ্গলিকে বাঁচাতে হবে। না, কাল বিহানেই সে কাম শুরু করবে।

পরের দিন সকালেই সুখনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মালিকের গোরু-ভৈঁসা চরানোর কাম পেয়ে গেল। দিনভর ভৈঁসা চরায়। আপন মনে গানা গায়। নানা কথা ভাবে। পাখির ডাক শোনে। সুযোগ-সুবিধা পেলে বনমুরগির ডিম সংগ্রহ করে, খরগোশ মারে, আমলি বিহি পাড়ে। সন্ধ্যায় গরু-ভৈঁসা নিয়ে ফেরে। হপ্তা শেষে গোরু-ভৈঁসা পিছু কয়েক মুঠো চাল পায়। এভাবেই গ্রামের অন্যান্য গোরু চরানোর কাজ জোটে। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে গোরু-ভৈঁসা রক্ষার প্রয়োজনে একজন চরোইয়া দরকার হয়ে পড়ে। মুঙ্গলিও কাজ খুঁজে নিয়েছে। রতনবাই অবস্থাপন্ন ঘরের গিন্নি। ধান ঝাড়াই-বাছাই, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজ। মুঙ্গলি বহাল হয়ে যায়। পারিশ্রমিক হিসেবে সেও কিছু ধান, গম, ডাল উপার্জন করে। উদ্বৃত্ত সংগ্রহ বিক্রি করে তেল, নিমক, চুড়ি, কাপড় কেনে। দিন ক্রমশ সুখের হয়।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে যায়। শিউয়া পাহাড়ের আড়ালে সূর্যটা ঢাকা পড়ে। জঙ্গলের ভেতরে অন্ধকার ঘন হয়। সুখনের মন আনচান করে। ভৈঁসার পাল জমা দিতে-দিতে বাড়ি ফেরে। তখন সন্ধ্যা। গ্রামের মানুষ ঘরে ঘরে আশ্রয় নেয়। গ্রামের চৌতারায় শুকনো কাঠের আগুন জ্বলে। সারা রাত এই আগুন জ্বলতে থাকে। বন্য পশুর আক্রমণ থেকে গ্রামরক্ষার কারণে এই আগুন জ্বালা হয়। পালা করে কাঠ জমা দিতে হয়, আগুনে জ্বালাতে হয়। অবস্থাপন্ন মানুষেরা এখনও জেগে। তাদের খামারে পেটভাতার মজুর দিনের এই সামান্য অবসরে বসে দুখসুখের গল্প করে। সুখন আজ সেখানে দাঁড়ায় না। আজ তার একটু দেরি হয়ে গেছে। হন হন করে নিজের ঝোপড়ির দিকে হাঁটে। বাপ বেঁচে থাকতে তার চিন্তা ছিল না। দেরি দেখলে বাপ ঝোপড়ির বাইরে বসে চুটি টানত। খক খক কাশত। কিছু দিন হল বাপটা চলে গেল। মরার আগে বড়ো কষ্ট পেয়েছিল। পেটের বিমারি ছিল। সারাক্ষণ কাটা বোথরার মতো যন্ত্রণায় ছটফট করত। সুখন কাছে গেলেই শান্ত হয়ে যেত।

বলত, হাম ঠিক হে টুরা। তু দিল লাগাকে কাম করিহ। হামার ফিকর নহি।

সুখনের আঁসু আসত। দুঃখে বুকটা ভেঙে যেত। হঠাৎই এক অন্ধকার রাতে বাপ ফৌত হয়ে গেল। বুকের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে সুখন কেঁদেছিল। ঠিক তার চার রাত পরেই মুঙ্গলি দিলখুশ খবর দিল, টুরা আওমে। উল্লাসে, আনন্দে সুখন মুঙ্গলিকে কোলে তুলে ঘরের বাইরে নাচ শুরু করল। তার উল্লাস দেখে প্রতিবেশী মানুষজন দৌড়ে এল, কা খবর হো সুখন? ইতনি খুশিয়ালি কা বর?

সুখন জবাব দিয়েছিল, হামার টুরা আওমে! মুঙ্গলি তিহারুর কবল থেকে কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে লজ্জায় ঝোপড়িতে মুখ আড়াল করেছিল। গাঁয়ের ডওকীরা মুঙ্গলিকে ছেঁকে ধরেছিল। দুধেল জ্যোৎস্নায় গ্রামের আঙিনা নাচ-গান-আনন্দে মুখর হয়েছিল।

সুখন জোর কদমে এগোয়। তার দায়িত্ব অনেক। সংসারে একটা নতুন মানুষ আসছে। বাপ চলে যাওয়ার বছরে এক বোরা ধানের সাহায্য কমে গেল। সুখনের মাপা রোজগার। ভৈঁসা-পিছু এক মুঠা চাওল। দুজনের ভুখ মেটে না। মুঙ্গলির ধানভানাই, ঢেঁকি পাড়াইতে কিছু রোজগার হয়। কিন্তু মুঙ্গলিও তো আর কিছুদিন পরে বসে যাবে। এখনই ওর পেট ঢ্যাবঢ্যাব করে। জোর কদমে হাঁটলে চললে শ্বাস ওঠে। টুরা পয়দা হলে আরও এক মাসের আশ। কাম ছেড়ে থাকলে চাওল ঘাটা হবে। সুখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, এখন থেকে সে রোজ কিছু ভাত কম খাবে। এক মুঠা চাওল রোজ বাঁচাবে।

ঝোপড়ির দরজায় টোকা দেয় সুখন—এ মুঙ্গলি, কেওর খোল।

দরজাটা খুলেই মুঙ্গলি শুয়ে পড়ে। তিহারু অস্থির হয়। মাথার কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, তবিয়ত বুরা মালুম হওমে কা?

অ্যায়সেই।

ছকুলালের মার কথা সুখনের মনে আছে। ছকুলালের মা গ্রামের ধাত্রী। সুখন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, ছকুলালকে দাইলা (মাকে) বোলা লাহুঁ কা?

নেহি। অ্যায়সেই শোতে রহঁ। মড়কন থকাওট হে।

তু অব কামসে ঝিন যাহ।

তু ঝিন শোঁচিহ। অব হম ঠিক হে। কোই তকলিফ নেহি থে। অব হামনকে কামাই দুগুনা হোনা চাহি।

হম দুসর গাঁওকে আউর ভৈঁসা চরায়েবর লে লিহঁ। তো কুছ জাদা চাওল মিলহি।

নেহি। অ্যায়সেই তোলা ওয়পসিমে আন্ধার হো যাথে। হম আউর কুছ দিন কাম কর শেকিহঁ। চল অব খানা খালে।

শালপাতায় লাল চালের ভাত, বুনো আলুর ঝোল এবং শামুকচচ্চড়ি পরম তৃপ্তির সঙ্গে সুখন খেয়ে ওঠে। মুঙ্গলির সব বিস্বাদ লাগে। ভাত নিয়ে নাড়া-চাড়া করে। সুখন শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মুঙ্গলি বলে, অব অ্যায়সৈচ হওমে। তু জঙ্গলমে খড়কন ইমলি লানিহ। ইমলি খানেকা বড়া শখ হওমে।

মুঙ্গলির পাশে শুয়ে সুখন তার সারা শরীরে হাত বুলায়। তার কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করে। মুঙ্গলির পেটে কান পেতে শোনে। বাচ্চার নড়াচড়া টের পেয়ে আনন্দিত হয়। বলে, ই টুরা বহুত বদমাশ হোহি।

মুঙ্গলি প্রতিবাদ করে, টুরা নেহি, টুরি হোহি।

নেহি, টুরা হোহি। দৃঢ় প্রতিবাদ করে সুখন।

নেহি, টুরি হোহি। হাম ওকার শাদি দিহঁ। শাদিমে পাঁচবোরা চাওল লিহঁ। কাপড়া আর চাঁদিকে জেবর লিহঁ।

তোহর বহুত লালচ হে মুঙ্গলি। টুরি নেহি, টুরা হোহি! হাম শুনে হোইয়ে দেখ। আবার পেটের ওপর কান পাতে সুখন। বলে, জরুর টুরা হোহি।

মুঙ্গলি বিরক্তিতে সুখনকে ছুঁড়ে দেয়। খাটিয়ার ওপর থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। সেও রেগে ওঠে। বলে, জরুর টুরা হোহি। বহুত কামিয়াব হোহি। হিম্মতদার ডওকা বনহি।

তু তোহর টুরা লেকে রহ। হাম তোর ঘর নেহি রহেন। মুঙ্গলি অভিমান করে।

যা তু তোহর বাপ ঘর চল দে। তোহর সঙ্গ কোই সম্বন্ধ নেহি! টুরা হোনেপর ভেজ দিহ। অন্য খাটিয়ায় সুখন পাশ ফিরে শোয়।

দুঃখে, অভিমানে মুঙ্গলির চোখে জল আসে। এত বড়ো কথাটা তাকে সুখন বলতে পারল! বাপঘর চল দে। ঠিক আছে। কালই সে তার বাপের কাছে চলে যাবে। আর আসবে না। সুখন ডাকলেও না।

সকালে আর কোনো কথা হয় না। দুজনেই গম্ভীর। মুঙ্গলি ভেবেছিল,

সুখন বলবে, কাল রাতের কথা দিলে রাখিস না। সুখন ভেবেছিল মুঙ্গলি বলবে, টুরা কি টুরি আমি কেমন করে জানব। যাই হোক, সে তো আমাদের। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না। সুখন কাজে বেরিয়ে যায়।

সুখনের মনটা আজ ভালো নেই। গরু-ভৈঁসা জঙ্গলের মাঠে ছেড়ে, উদাস হয়ে থাকে। সবকিছু বিস্বাদ লাগে। অকারণেই ভৈঁসাকে পিটায়। ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় বসে। মুঙ্গলির কথা ভাবে। আহা বেচারি। ওর যখন একটা টুরির শখ—হোক না। এটাই তো শেষ নয়। এর পরেরটা না হয় টুরা হবে। অকারণে ওর দিলে কষ্ট দিয়েছে সুখন। বেচারি এক দিনের জন্যও তাকে ছেড়ে যায়নি। দুদিন বাপের ঘরে থাকব বলে গিয়েছে, তো সামের বেলা ঝোপড়িতে ফিরে সুখন অবাক। খানা তৈয়ার। চলে আসার কারণ পুছলে বলে, তোলা ছোড়কর রহনে কা দিল নেহি হওমে। মোলা নিদ নেহি আওমে। সুখন খুশি হয়ে তাকে বুকের কাছে টেনেছে। আদর করেছে। দুজনে ওয়াদা করেছে, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। অথচ সব জেনেও সুখন তাকে বলল, বাপঘর চল দে। না, সে আজ মুঙ্গলির কাছে মাফি চেয়ে নেবে। তার বহুত কসুর হয়েছে।

সুখনের মনে পড়ল, মুঙ্গলি তাকে ইমলি আনতে বলেছিল। মুঙ্গলি ভাত খেতে পারে না। ইমলির উদ্দেশ্যে জঙ্গলের দিকে তিহারু হাঁটা দেয়। গোরু-ভৈঁসাদের একত্রিত করে বলে, তুমন এতি উতি ঝিন ভাগিহ। এতি চরত-ঘুমত রহ। হাম সড়কন ইমলি লে কর আওমঁ। আতে সাম তুমনলা ফিরা লে যাই। গোরু-ভৈঁসা নির্বিকার চিত্তে ঘাস ছিঁড়ে খায়।

সন্ধ্যা নামার আগেই সুখন ঝোপড়িতে ফিরল। মাথার ওপর কাঁচা তেঁতুলের বোঝা। খুশি মনে দরজায় ধাক্কা দিল। কোনো সাড়া না পেয়ে, বেশ কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে বলে, মুঙ্গলি কেওর খোল। মোলা গলতি হো গিসে। হাম মাফি মাঙ্গ লেই। কিন্তু দরজা খোলার কোনো শব্দ না পেয়ে, আবিষ্কার করে—দরজাটা বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সুখন দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। হাঁড়ি-কুড়ি উলটে দেখে। মুঙ্গলির উপস্থিতির কোনো চিহ্ন নেই। এমনকি সকালের জলে ভেজা ভাতের অর্ধাংশ যা সে মুঙ্গলির জন্য রেখে গিয়েছিল, তেমনি পড়ে আছে। তার মুখের কথা মুঙ্গলির বুকে কি গভীর আঘাত করেছে অনুমান করে ফুলঝোরিয়ার ভিতর দিয়ে সুখন দৌড় দিল। কিন্তু শিলতোড়ায় মুঙ্গলির বাপের কাছে শুনল, মুঙ্গলি নেই আয়ে হে।

আর স্থির থাকতে পারে না সুখন। ফুলঝোরিয়ার বন তোলপাড় করে। তীব্র চিৎকারে ডাক দেয়, মুঙ্গলি। সেই চিৎকার পাহাড় থেকে পাহাড়ে, গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে ধাক্কা দেয়। অন্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা মুঙ্গলি আর চুপ থাকতে পারে না। সেই ডাক তাকে বিহ্বল করে। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। চোখের কোনা করকর করে। সেও ফুলঝোরিয়ার জঙ্গলে দৌড় দেয়। অনেকক্ষণ দৌড়াদৌড়ির পর দুজনে দুজনকে খুঁজে পায়। সুখনের বুকে মুখ রেখে মুঙ্গলি কান্নায় ভেঙে পড়ে। সুখনও মুঙ্গলিকে বুকে জড়িয়ে কান্নার আবেগ চেপে রাখতে পারে না।

রাত্রে তেঁতুলবাটা চাটনি লঙ্কা মেখে, মুঙ্গলি জিভের আগায় ঠেকায়। তালুতে জিভ ঠেকিয়ে টকাস টকাস তারিফের শব্দ করে। ভেজা ভাত আলু পুড়িয়ে খেয়ে ওঠে। সারা রাত তারা অনর্গল কথা বলে। মুঙ্গলি বলে, সুখন শোনে। সুখন বলে, মুঙ্গলি বালিকার মতো খিলখিল করে হাসে। শেষ রাত্রে মুঙ্গলি পেটে একটা ব্যাথা অনুভব করে। মাঝে মাঝে ককিয়ে ওঠে। সুখনের ঘুম ভেঙে যায়। ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুঙ্গলি তাকে শান্ত করে। বলে, অভি কুছ নেহি হোয়া ইতনি দৌড়নেকা কারণ থড়কন দরদ হওমে। উয়ো ঠিক হো যাহি।

সকালে বেরোনোর সময়ে সুখন মুঙ্গলিকে বলে, আজ কাম পর ঝিন যাহ। ঘরমে শোতে রহিহ।

মুঙ্গলি কিন্তু এখন সুস্থ বোধ করে। সে সুখনের ব্যস্ততায় হাসে। সে জানে, এখনো সময় হয় নি। এত ব্যস্ততার কিছু নেই। তাকে মালকিনের কামে যেতে হবে। মালকিন বড় গৃহস্থী। তার ক্ষেতে হরেক ফসল। মালকিন তাকে আগের দিনই বলে দিয়েছে, ঢেঁকি পাড় দিয়ে দালের খোসা উখড়াতে হবে। কামে না গেলে অন্য রেজা ঠিক করে নেবে। মুঙ্গলির লোকসান হবে। খোসা উখড়ালে দু-কুলা দাল পাবে। আর একমাস পরে সে তো কোনো কাজই করতে পারবে না। তখন জুটবে কোথা থেকে। সুখনের চালে তো ভুখ মেটে না। দালটা যদি পাওয়া যায় সুখন খুশি হবে। দাল তার বড়ো পছন্দ। চুমুক দিয়েই খানিকটা খেয়ে নেয়। মুঙ্গলির রান্নার তারিফ করে। নাঃ, গদিয়ে-মদিয়ে বসে থাকলে হুথ মিটবে না। অভাবের গেরস্থি। মুঙ্গলি উঠে পড়ে।

মুঙ্গলির দেরি দেখে মালকিন রতনবাই বিরক্ত হয়। দুটো কথা শোনায়।

মুঙ্গলি তড়িঘড়ি করে নিজের কাজে লাগে। ঘরের ভেতর থেকে দু বস্তা ডাল ঢেঁকিশালে নিয়ে আসে। মাথায় তুলতে গেলে পেটে চাড় লাগে। প্রায় হেঁচড়ে আনে। মালকিন হা হা করে ওঠে। অগত্যা সেই মাথায় তুলেই আনতে হয়। মাটি পাথর বেছে কুলোয় টোকা দেয়। দুপুর নাগাদ ঢেঁকির পাড় দেওয়া শুরু হয়। মালকিন হাত লাগায়, ঢেঁকির গর্তে ডাল ঠেলে দেয়।

ঢেঁকি ওঠে নামে। ডালের খোসা ধীরে ধীরে আলগা হয়। সোনারঙের ডাল কালো খোসার মাঝে হাসতে থাকে। মালকিন একমুঠি ডাল হাতে নিয়ে ফুঁ দিয়ে খোসা ওড়ায়। ব্যাজার মুখে বলে, দিল মে তাগদ নেহি হে কা? মাঙ্গনি দাল মিলহি? পুরা ছিলকা নেহি উখাড়ে হে। জারা তাগদ লাগা। মুঙ্গলি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঢেঁকি পাড় দেয়।

তখন চরাচরে সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহ। গোয়ালঘরের পাশে নিচু ঢেঁকিশাল অসহ্য গুমোট। শরীর ঝলসে যায়। ঘামে সারা শরীর ভেজা। মুখ যেন রাঙা সিঁদুর। পেটের ব্যথাটা আবার অনুভব করে মুঙ্গলি। দাঁতে দাঁত চেপে, ঢেঁকিতে শক্তি প্রয়োগ করে। ব্যথাটা টাটিয়ে ওঠে। ক্রমশ নিচের দিকে নামে। হঠাৎ যেন মনে হয়, জানু বেয়ে একটা তরল আগ্নেয় স্রোত পায়ের পাতায় নামে। রক্ত দেখে মালকিন চমকে ওঠে। বলে, এ মুঙ্গলি জলদি উতার। তোহর খুন গিরমে। সব বরবাদ হো যাহি।

কিন্তু হাতের দড়িটা ছেড়ে মুঙ্গলি দাঁড়াতে পারে না। শরীরটা শক্তিহীন, বিষম ভার। ঢেঁকির গোড়াতেই সশব্দে টলে পড়ে। মুঙ্গলি জ্ঞান হারায়। জায়গাটা রক্তক্ষরণে ক্রমশ ভিজে ওঠে।

সুখন পাহাড়তলিতে ভৈঁসা চরায়। দূরগামী ভৈঁসার ঘণ্টা শুনে চিৎকার করে, এ কালি, এতি আ। পাহাড়ের ওপারে আশমান দেখে। আশমানে তখন অস্তগামী সূর্যের রঙফেরা। সেই রঙ শুখা নালার জলে গুলাল ছড়ায়। হাড়িয়ালেরা স্নান সেরে পাহাড়ের ওপারে উড়ে যায়। ডানায় বিচিত্র বর্ণালি। সুখনের মনটাও যেন উড়ে যেতে চায়। পাহাড়, জঙ্গল, ভৈঁসার ঘণ্টার টুংটাং তার প্রসারিত দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। একটা ছোট কুটীরের দাওয়ায় কোলে একটি সবল সুন্দর শিশু নিয়ে মুঙ্গলিকে বসে থাকতে দেখে। মনটা খুশিতে ভরে যায়। সুখন গান গায়।

ঠিক এই সময়েই পওন এসে খবর দেয়, এ সুখন, জলদি আ। মুঙ্গলিলা

বহুত বিমার হে। ওকার তবিয়ত ঠিক নেহি। রতনবাইকে ঘরমে গির পড়িলে।

উন্মাদ অধীরতায় সুখন যখন রতনবাইর ঘরে এল, সেখানে এক বিরাট জটলা। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ প্রায় সবাই উপস্থিত। ঘরের ভেতরে রক্তাপ্লুত মুঙ্গলি। পাশে ছকুলালের দাই, দুখন ওঝা। শঙ্কিত, ভীত সুখন আস্তে ডাক দেয়, মুঙ্গলি।

দুখন ওঝা জবাব দেয়, মুঙ্গলি ওর বাত না কহি। উয়ো শিউজিকে পাশ চল দিস।

সুখন স্তম্ভিত। মুঙ্গলি চলে গেল। বিন বাত-চিতই চলে গেল। তাকে একটা কথা বলতেও দিল না। এমনি বেইমান! ওয়াদার খিলাপ করল! হঠাৎ খেয়াল হয়, জিজ্ঞাসা করে, হামার টুরা?

ওকর জনম নেহি হোয়। ওলা সাথ লেকর মুঙ্গলি চল দিস। ছকুলালের মা উত্তর দিল।

মুহূর্তে সব কেমন অর্থহীন শূন্যতায় ভরে যায়। সুখন তাকিয়ে থাকে। কিছুই যেন দেখতে পায় না। মুঙ্গলির শরীরটাও ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে নেই। মুঙ্গলির মুখটা যেন এখনও সজীব। সে যেন এখনই কিছু বলবে সুখনকে। কিন্তু দুঃখে, বেদনায়, অভিমানে সে দৃঢ় হয়ে থাকে। অথবা সে যেন এখানে নেই। তার সামনে শববাহনের ব্যবস্থা হয়। বাঁশ, কাঠ বাঁধা হয়। এতদিন যে মানুষটা সুখনের হৃদয় জুড়ে ছিল, এখন সে মড়া। তার জন্য মানুষের আর কোনো দরদ নেই। আগুনের শিখায় সব শেষ হবে। মুঙ্গলির শরীর, স্মৃতি, স্পর্শ—সব জালিয়ে-পুড়িয়ে তবেই মানুষের নিস্তার। মুঙ্গলি নামে এই গাঁয়ে কেউ ছিল, ফুলঝোরিয়ার জঙ্গলে তার পায়ের ছাপ শিলতোড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, সব চৌপট হয়ে যাবে।

নীরব আচ্ছন্নতায় সুখন সকলের সঙ্গে চলে। দু-চারজন তার পাশে হাঁটে, সান্ত্বনা দেয়। সুখনের কানে পৌঁছয় না। গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে শ্মশান। চিতা সাজানো হয়। গাঁয়ের মানুষের কথায়, যন্ত্রচালিতের মতো চিতায় আগুন দেয়। কলসি ভরে জল আনে। ফুল ছড়ায়।

চিতাটা দাউদাউ জ্বলে ওঠে। সুখনের চোখ ঘোলাটে, দৃষ্টিতে ঘোর লাগে। মুঙ্গলি পুড়ছে, এ যেন সে ভাবতেই পারছে না। গতরাত্রে মুঙ্গলি তার বুকের

যেখানে মুখ রেখেছিল, হাত বুলোয়। তীব্র জ্বালা অনুভব করে। ওই আগুন যেন তারই বুকে জ্বলছে। তার অস্তিত্ব যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আগুনের দাউদাউ শিখা তার সুখ, তার স্বপ্ন, তার জীবন, ভবিষ্যৎকে গ্রাস করছে। সুখন অস্থির হয়। সে যেন দাঁড়াতে পারে না। জলন্ত চিতার দিকে এগিয়ে যায়। উপস্থিত মানুষেরা হৈ হৈ করে ওঠে। তাদের কিছু বোঝার আগেই জলন্ত একটা কাঠ নিয়ে সুখন গ্রামের দিকে দৌড়ায়। নিজের ঝোপড়ির শুকনো পাতায় কাঠটা গুঁজে দেয়। প্রজ্বলিত আগুনের সামনে উল্লাসে লাফায়। অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে মুঙ্গলির গড়া সংসারটা সে জলে ছাই হতে দেখে।

দু'শ বছর আগে ভারতে ফরাসি কবি

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এ বছর ফরাসি বিপ্লবের দু'শ বছর পূর্ণ হবে আগামী ১৪ই জুলাই। এই সূত্রে এ বছর এদেশে ফরাসি বৎসর উজ্জাপিত হচ্ছে ; খুব ভালো কথা, আসুন দু'শ বছর আগে আমাদের দেশে কি ঘটেছিল তার দিকে নজর দিই। ইতিমধ্যেই ১৭৫৮ সালে পলাশীর যুদ্ধে জিতে ইংরাজরা কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেছে এবং সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ দখলের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান শত্রুরা হল পশ্চিম ভারতের মারাঠারা, উত্তর ভারতে অযোধ্যার নবাব আর দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদের নিজাম ও মহিশূরের হায়দর আলি এবং ফরাসি কোম্পানি।

এই টালমাটালে মহিশূরের হায়দর আলি ইংরাজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর টিপু সুলতান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ১৭৮৮ সালে টিপু ভের্সাইতে দূত পাঠালেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে ফরাসি রাজা ষোড়শ লুইয়ের সাহায্য পাবার আশায়।[১] বুঝতেই পারছেন, ঐ সময়ে, অর্থাৎ হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের রাজত্বকালে মহিশূরে অনেক ফরাসির সমাগম হয়েছিল—তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি, তাঁর নাম এতিয়েন জুই, জীবৎকালে কবি ও ফিচার লেখক হিসাবে জুই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ফিচার লিখতেন, এরমিত দ শোসেদঁত্যা, এই ছদ্মনামে। জুই-এর জীবন-বৃত্তান্ত দিয়ে শুরু করা যাক। কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ির ছেলে এতিয়েন জুই-র জন্ম ১৭৬৪ সালে। ভের্সাইতে মিলিটারি ইস্কুলে পড়তে গেলেন, ছেলে পড়াশোনায় ভালো কিন্তু ডানপিটেমি আর উচ্ছৃঙ্খলতায় আরও ভাল, শাস্তি দিয়ে মাস্টারমশায়রাও হার মানলেন। তাই ডানপিটেকে শায়েস্তা করবার জন্য ষোল বছর বয়সে মিলিটারি সার্ভিস করবার জন্য তাঁকে পাঠানো হল ফ্রেঞ্চগিয়েনায়। সেখানে যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়ে ডানপিটে ছেলের জ্ঞান হল ; দেশে ফিরে তিন বছর শান্ত হয়ে পড়াশোনা শেষ করে ১৭৮৮ সালে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর

লেফটানেন্ট হিসাবে ভারতে এলেন। কিছুদিন টিপু সুলতানের দরবারে কাটিয়ে তিনি যান করমণ্ডল উপকূলের ফরাসি উপনিবেশে তারপর চন্দন নগরে বছরখানেক কাটিয়ে দেশে ফিরলেন ১৭৯০ সালে, ফরাসি বিপ্লবের এক বছর বাদে। ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে, যুদ্ধপ্রিয় জুই কিন্তু পদ্য লিখতেন ; দেশে ফিরে ১৭৯১ সালে প্রকাশ করলেন পদ্যে লেখা রচনা 'গালরী দে ফামলেলেত্র।' এই বছরই প্রকাশিত হল পদ্যে লেখা রচনা 'মে ভোয়াইয়াজ', এতে তিনি তাঁর ফ্রেঞ্চ গিয়েনা ও ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এদেশে যখন তিনি ছিলেন তখন বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল, সেই সূত্রে তাঁর মন্তব্য হল :

"কুকর্মের দ্বারা ইউরোপিয়
গঙ্গার তীরকে করেছে আতঙ্কিত
একজন লর্ড ক্লাইভের দুষ্কর্ম
একজন হেসটিংসের ডাকাতি।
ঈশ্বরের বদান্য হাত যে জমি
ফসলে দিয়েছে ভরে
সেখানে দেখলাম দুর্ভিক্ষ
জনক তার রাজনীতি, কোলকাতায়
বাহবা দিচ্ছে নিজেকে
সমগ্র এক জাতির মৃত্যুতে।
আর ইংরাজ করছে হিসাব, এই মড়কে
মসলিনের দাম কমবে কতো।"[২] (অনুবাদ লেখক)

১৭৯১ সালে জুইকে আবার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হলো কিন্তু লেখার নেশা ইতিমধ্যেই তাঁকে ভালোভাবেই ধরেছে তাই ১৭৯৪ সালে পাকাপাকিভাবে অসি ছেড়ে মসি ধরলেন। ১৭৯৮ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে পেশাদার মঞ্চের জন্য তিনি আটটি নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে 'ল্য তাবলো দ্য সাবিন' সরকারি নাট্যমঞ্চ 'ওপেরা কমিক'-এ মঞ্চস্থ হয়। ১৮১১ সালে তাঁর রচিত তিন অঙ্কের মেলোড্রামা 'লে বাইয়াদের' কাতেল-এর সুর সংযোগে ওপেরাতে অভিনীত হয়। ১৮১৩ সালে 'টিপু সাহেব' নামে টিপু সুলতানের পরাজয়কে বস্তু হিসাবে নিয়ে লেখা ট্র্যাজেডি মঞ্চস্থ হয় নাটকের মক্কা 'পালেরোয়াইয়াল'-এ। ১৮১৫ সালে তিনি ফরাসি আকাদেমির সভ্য হন এবং ১৮৩০ সালে তিনি মারা যান।

জীবৎকালে জুই 'এরমিত দ শোসেদঁত্যা' নামে বিখ্যাত ছিলেন ; এই খ্যাতির কারণ হল যে তিনি এই ছদ্মনামে সেই আমলের সর্বাধিক প্রচারিত বিখ্যাত দৈনিক 'লাগাজেত দ লা ফ্রঁস' কাগজে পারির দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবন নিয়ে ফিচার লিখতেন। জুই ছিলেন ভলত্যের-এর ভক্ত, প্রতি মঙ্গলবার তাঁর বসবার ঘরে ভলত্যের-এর মর্মর মূর্তির নীচে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো ; এই আড্ডায় ভবিষ্যত ফরাসি সাহিত্যের পুরোধা যুবক নোদিয়ে, লামার্তিন ও ভিক্তি আসতেন এরমিত দ শোসেদঁত্যার মুখে ভারতের গল্প, তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও ফ্রেঞ্চ গিয়েনার গল্প শোনবার জন্য। এই সূত্রে লামার্তিন বলেছেন : "কবির সঙ্গে দেখা হওয়া আমার কাছে ছিলো একটা সুখের অনুভূতি।"[৩]

১৮১১ সালে 'লে বাইয়াদের' অভিনীত হয় ওপেরাতে। গল্পটা বেশ মজার। বেনারসের অবিবাহিত হিন্দু রাজাকে বিয়ে করতে হবে এবং তাঁকে বৌ বাছতে হবে তাঁরই অন্তঃপুরের তিনজন প্রিয় সেবিকার মধ্য থেকে ; কিন্তু রাজা এক দেবদাসীর প্রেমে পড়েছেন। রাজা চিন্তিত, দেবদাসীও রাজার প্রেমে হাবুডুবু। এমন সময় মারাঠারা বেনারস আক্রমণ করল ; রাজা বন্দী হলেন, দেবদাসী চাতুরী করে রাজাকে মুক্ত করল এবং রাজা প্রচুর বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে অল্প সৈন্য নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে বেনারসকে মারাঠার কবল থেকে মুক্ত করলেন। তারপর রাজা গুজব রটালেন যে তিনি গুরুতর ভাবে আহত এবং হয়ত বা বিয়ের পরেই মারা যাবেন অর্থাৎ যিনি রানী হবেন তাঁকে বিয়ের পরেই মৃত রাজার চিতায় উঠতে হবে, তিন সেবিকার মধ্যে কেউই রাজি হল না মরণাপন্ন রাজার রানী হতে, দেবদাসী কিন্তু রাজি হল। এই হল গল্প। নাটকের মুখবন্ধটি বিরাট, প্রায় কুড়ি পাতা, এখানে জুই তাঁর ভারত প্রবাস ও ভারত সম্পর্কে তাঁর বাস্তবিক জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছেন।

ফরাসি ভাষায় বাইয়াদের কথাটি এসেছে পর্তুগিজ ভাষা ঘুরে ; পর্তুগিজরা দেবদাসীদের বলতো শলেদেরীয়া তার থেকেই এসেছে বাইয়াদের কথাটি—জুই একথা বলেছেন। দেবদাসীদের তিনি প্রাক-খ্রীষ্টান রোমের ভেস্টার পূজারিণীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং দেবদাসীদের নাচে অভিনয় অংশটিও ধরতে পেরেছিলেন, এই সূত্রে তিনি বলেছেন : "দেবদাসীদের নাচে এক ধরনের খুঁত ধরা যায় যা সুখ্যাতি হিসাবে আমাদের অভিনেত্রীদের সম্পর্কে কদাচিৎ বলা যায়, তা হল, তারা তাদের ভূমিকার মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে ঢুকে যায় এবং অনুকরণের

মধ্যদিয়ে বাস্তবের সীমানায় পৌঁছয়।"[৪] এই মুখবন্ধেই তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর এই অপেরার পোশাক সম্পর্কে উপদেষ্টা ছিলেন এক ফরাসি মহিলা "যিনি অনেকদিন চন্দন নগরে বাস করেছেন।"

জুই রচিত পাঁচ অঙ্কের ট্রাজেডি টিপু সাহেব ২৭ জানুয়ারি ১৮১৩ সালে 'পালে রোয়াইয়াল'-এ অভিনীত হয়। নাটকটির আগে লেখকের একটি ভূমিকা আছে, তাই দিয়ে শুরু করছি। "আমার যৌবনের প্রথম কয়েকটি বছর আমি ভারতে কাটিয়েছি, সেই গঙ্গা ও সিন্ধু বিধৌত দেশ, যেখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে কোমল ও সবচেয়ে সহৃদয় লোকদের বাস, সেইখানে। আমি সেই প্রাচীন কাব্যময় ধর্ম ও সেই অনাদি কালের আচার ব্যবহারের সাহচর্যে বা বরং তার দ্বারা মোহিত হয়ে বাস করেছি যার মধ্যে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত শ্রীউইলিয়াম জোন্স গ্রীসের সমস্ত নীতিকথার জননীকে খুঁজে পেয়েছেন। যে বয়সে অত্যাচার ও দুঃখের দৃশ্যগণের মধ্যে গভীর ও অনপনেয় ক্ষতের সৃষ্টি করে সেই বয়সে, ইংরাজদের অর্থগৃধ্নুতা ও রাজনীতির ফলে এই সুভগ দেশে দুঃখের যে প্লাবন বহেছে তার আমি সাক্ষী। এই সময়ে একমাত্র রাজপুরুষ যিনি এই অভূতপূর্ব জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তিনি হলেন মহিশূরের সুলতান টিপু সাহেব। দু'বার তাঁর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তাঁর সৈন্যদলের কয়েকজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে আমি তাঁর চরিত্র, তাঁর মহান উদ্দেশ্য এবং ইংরাজদের সম্পর্কে তাঁর গভীর ঘৃণা যা তাঁর উগ্রতাকে সমর্থন করে তার কথা জেনেছি। ইউরোপে ফিরে সেই দেশটি যাকে ঈশ্বর দু'হাতে দান করেছেন এবং যাকে মানুষ সমস্ত অনাচার ও সমস্ত উৎপীড়নের মঞ্চে পরিণত করেছে তার স্মৃতি আমার মনে আজও উজ্জ্বল। আমার সমস্ত স্মৃতিচারণেই ভারত উপস্থিত থাকে এবং সভ্যতার এই জননী আমার স্বপ্নে সদা উপস্থিত।"[৫] এইবার নাটকের কথাটি বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

আগেই বলেছি যে জুই ছিলেন ভলত্যের-এর ভক্ত, অর্থাৎ তিনি ছিলেন 'নিও ক্লাসিসিস্ট' ঘরানার লেখক, ফলে মঞ্চ সজ্জাকে তিনি প্রায় ব্যবহারই করেননি। নাটকটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীরঙ্গপত্তমের দুর্গের মধ্যেই আবদ্ধ। মঞ্চে কিছুই ঘটছে না, যা কিছু ঘটছে সবই নেপথ্যে ; মঞ্চে শুধু তার অভিঘাতটি দেখা যাচ্ছে এবং ঘটনাটি জানা যাচ্ছে সংলাপের মাধ্যমে। নাটকটি পদ্যে রচিত—সংলাপগুলি আলেকজঁদ্রিণ পদ্যে বাঁধা, ফলে তা কথ্য ভাষার এত কাছে

যে মন দিয়ে না শুনলে মনে হবে যে তা বুঝি গদ্যে লেখা। পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আছেন টিপু, তাঁর বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী মীরশাদেক, বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাধ্যক্ষ রেমোঁ, টিপুর কন্যা আলদেইর (এই চরিত্রটির ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে, মনে হয়, নারী চরিত্র বিবর্জিত নাটক ফরাসি মঞ্চে একটু বেমানান হয় বলে জুই প্রায় জোর করে একটি নারী চরিত্র নাটকে রেখেছেন) এ ছাড়া আছে ইংরাজ দূত একজন সেনাধ্যক্ষ এদের সঙ্গে আছে কিছু নির্বাক সৈন্য ও আলদেইর-এর নির্বাক সহচরীর দল। ঐতিহাসিক বাস্তবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির বাস্তব ধর্মিতার কারণটি হল জুই-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

নাটকটির শুরুতেই আমরা জানছি যে টিপুর পতন অবশ্যম্ভাবী এবং টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের দুর্গে অবরুদ্ধ আমরা আরও জানছি যে মন্ত্রী মীরশাদেক মোটেই খুশি নয় কারণ সে বুঝেছে যে ফরাসি সেনাধ্যক্ষ রেমোঁ টিপুর বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠছে এবং টিপু তার চেয়ে রেমোঁকে বেশি বিশ্বাস করেন, সে টিপুর কাছে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। একজন ইংরাজ দূতের আসবার খবর আসছে, যুদ্ধ স্থগিত রাখবার শর্ত নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আমরা জানছি যে টিপু তাঁর মেয়েকে নিয়ে তাঁর অন্যান্য সন্তানদের কাছে প্রাসাদে ফিরে যেতে চান। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখছি যে ইংরাজ দূত রেমোঁর সঙ্গে আলোচনা করছে; টিপুর পতনের পর রেমোঁকে বাঁচাবার কু শর্তটি বলছে ও রেমোঁ ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করছে; আমরা জানছি যে শীঘ্রই চরম যুদ্ধটি হবে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দুটি দৃশ্যে দর্শক বুঝতে পারছে যে মীরশাদেক বিশ্বাসঘাতক এবং সে ইংরাজদের দলে। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দিকে বোঝা যাচ্ছে যে টিপু কুসংস্কারাচ্ছন্ন। চতুর্থ অঙ্কটি শুরু হচ্ছে মীরশাদেকের বিশ্বাসঘাতকতার আর একটি প্রমাণ দিয়ে, তার কারণটাও জানা যাচ্ছে; সে ইংরাজদের সাহায্যে টিপুর জায়গায় পুরোনো হিন্দু রাজার বংশধরকে বসাতে চায়, রেমোঁ তার পথের কাঁটা। অঙ্কটির শেষের দিকে খবর আসছে রাতে ইংরাজদের সম্ভাব্য আক্রমণের; টিপু তাঁর মেয়েকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিচ্ছেন (অল্প পরিমাণে করুণ রসের ব্যবহার হচ্ছে) এবং রেমোঁ টিপুর মীরশাদেকের আসল চরিত্রটি প্রমাণ করছে। পঞ্চম অঙ্কে টিপু মীরশাদেকের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিচ্ছেন এবং প্রতিশোধ হিসাবে মীরশাদেকও তাঁর অবশ্যম্ভাবী পতনের কথাটি জানিয়ে দিচ্ছে। শেষ দৃশ্যে আহত টিপু রেমোঁর কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন।

জুই মারফত জেনেছি যে দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রাজা নেপোলিয়ান এবং স্যাঁ-রোম্যা। এই স্যাঁ-রোম্যাঁর নাম টিপু সাহেব নাটকে হল রেমোঁ। নেপোলিয়ান নাটক দেখে খুশি হয়েছিলেন এবং নাম ভূমিকার অভিনেতা তালমাকে পরের দিন দেখা করতে বলেন। তালমাকে তিনি বলেন: "মালাভেলির চরম যুদ্ধের পর নিজের রাজধানীতে ঢুকে টিপু সাহেব যে ভুল করেছিলেন আমার সৈন্যদলের একজন কর্পোরালও তা করবে না এবং আমার সেই ভয়ই ছিল তাই ইজিপ্ত থেকে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে তাঁর সৈন্য সংখ্যা কমে দশ হাজারে দাঁড়ালেও তিনি যেন একাজ না করেন।"[৬] স্যাঁ-রোম্যাঁও নাটক দেখে খুশি হয়েছিলেন; অবশ্য নাট্যকার জুই নিজে কথাটি আমাদের জানান। স্যাঁ-রোম্যা নাটক দেখে খুশি হয়েছিলেন বা হন নি সেটা পরের কথা, আসল কথা হল স্যাঁ-রোম্যাঁ নাটকটা দেখতে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি টিপুকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন; অর্থাৎ দর্শক-মণ্ডলীতে অন্তত দুজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে টিপুর পরিচয় ছিল। আমরা ধরে নিতে পারি যে বেশির ভাগ দর্শকই টিপু সুলতানের কথা জানতেন। এই জানার বিভিন্ন সূত্রগুলির মধ্যে একটি প্রধান সূত্র হল রাজনীতি।

টীকা

১. Michand, J., *Historic desProgre´s etchute de l'Empire de Mysore*, 2 Vols. Paris 1801, Vol I, p 139.

২. E tienne Jouy, *Mes voyages œuvres complites*, Vol I, Paris 1823. p. 211-20.

৩. Pichois, Claude, *Pourune biograpeic d'Etienee Jouy Revre des Sciences Humaines* (Avril-Juin 1965). p. 227-52.

৪. Etienne Jouy, *Les Bayaderes*, Roullet, 1810, p 9.

৫. *Op., cit.*, Vol 18, p 8.

৬. *Ibid.*, p. 101.

নৌকাবিলাস

সুনীল দাশ

সামনের একসার দেবদারু গাছের সবুজ সম্মেলন কলেজ বাড়ির নতুন হলুদ রঙটাকে আরো বর্ণময় করে তুলেছে। গাঢ় নীলের ওপর সাদা ফুলের নকশা ছড়ানো শাড়িটা পরে মঞ্জুলিকা তারই সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই বোধহয় আরো বেশি করে নজরে পড়ল অর্পণের। অর্পণ এগিয়ে এসে বলল, 'আমি তো ভাবছিলাম কন্‌ফারেন্সের প্রথম দিনই দেখা হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে।'

'গতকালই এসেছি আমি। একেবারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে আছি। আশ্চর্য এরমধ্যে একবারও দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে!'

'চলো, চা-টা নিই। খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

'আমরাও যাবো যাবো ভাবছিলাম।' বলে মঞ্জুলিকা সঙ্গের দুই মধ্যবয়স্কার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—উনি আরতি মিত্র—বটানির। আর ইনি হলেন আমাদের ডিপার্টমেন্টাল হেড ডক্টর অনুরাধা ভট্টাচার্য। আর এই হ'ল অর্পণ মজুমদার—আমার য়ুনিভার্সিটির ক্লাসমেট। সার্ভিস কমিশনের একই প্যানেলে আমরা দুজনে ঢুকেছিলাম দুই কলেজে।'

অর্পণ হেসে বলল, 'সেটা আট বছর আগে। আর সাত বছর পর এইমাত্র ওর সঙ্গে দেখা হ'ল আবার।'

কথা বলতে বলতে সবাই এগোতে থাকল কলেজ বিল্ডিংয়ের ভেতরের দিকটাতে। কন্‌ফারেন্সের প্রতিদিনের খাওয়ার বন্দোবস্ত এইখানেই। চারিদিকে কলেজ বিল্ডিং—মাঝখানের বড় চত্বরটাতে প্যাণ্ডেল খাটানো। স্টিরিওতে সুচিত্রা মিত্র।

দূর থেকে একজনকে হাত নেড়ে ডাকতে দেখে ডক্টর ভট্টাচার্য বললেন মঞ্জুলিকাকে, 'তোমরা বোসো এখানটায়। ওপাশে অপরাজিতা আমাদের ডাকছে; একটু গল্প সেরে নিই ওর সঙ্গে।'

ওরা দুজন এগিয়ে গেল। অর্পণ আর মঞ্জুলিকা পাশাপাশি দুটো চেয়ারে

বসে পড়ল। মিষ্টির বাক্সে করে খাবার আর কাপে কাপে চা দিয়ে যাচ্ছে ভলেন্টিয়াররা। দূর মফস্বল শহরের কলেজের ছাত্রছাত্রী বলেই বোধহয় এদের উদ্দীপনার আলাদা এক মাধুর্য আছে। মেয়েদের সাদা জমির ওপর চওড়া লাল পাড় শাড়ি আর লাল ব্লাউজ। ছেলেদের পোশাকে এমন সংহতি না থাকলেও ছোটাছুটির ব্যাপারে ওদের ঘাটতি নেই কোথাও।

'সাত বছর আগে—এই রকম এক আশ্বিনের বিকেলেই শেষ দেখা তোমার সঙ্গে। সেই দিনটাই আমার মেয়ের জন্ম।' অর্পণের গলার স্বরে সাত বছরের পর্দা তুলে দেওয়ার আবেশ ধরা পড়ল।

'হাঁ। সেদিনই আবার আমি নর্থ বেঙ্গলে ফিরছিলাম। নইলে, খুব ইচ্ছে করছিল মেয়ে আর মেয়ের মাকে দেখে আসি।'

'তোমার মেয়েকে কার কাছে রেখে এলে মঞ্জু? মাকে ছেড়ে ও থাকতে পারে?'

'আমার এক পিসি থাকেন এখন আমার কাছে। আমার মেয়ের বয়সও তো দেখতে দেখতে দশ বছর হয়ে গেল।'

'ভাবা যায় মঞ্জুলিকা—এক সময় দুবেলা দেখা হ'তো। এখন সাত বছরে একবার।'

'এরপর হয়তো সময়ের দূরত্বটা আরো বাড়বে। তোমাদের কলকাতায় আর যাওয়াই হয় না আমার।'

মঞ্জুলিকার মুখে 'তোমাদের কলকাতা' কথাটা দূরত্বটাকে যেন সত্যিই অনেকটা বাড়িয়ে দিল নিমেষে। অর্পণ কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কালোর ওপর খুব মিষ্টি মুখের একটি মেয়ে খাবারের বাক্স রেখে গেল তাদের সামনে। আর ইমরান খানের মতো চুলের বিন্যাস নিয়ে একটি ছেলে রেখে গেল চায়ের কাপ। কলেজ জুড়ে এই ছেলেটির অনুরাগিণী যে অনেক তা অর্পণের চোখে এরই মধ্যে এসেছে।

মঞ্জুলিকা নামানো গলায় বলল, 'এই ছেলেটির নাম প্রবীর। প্রবীর চৌধুরী।'

আবার মঞ্জুলিকাকে তার চোখের ভেতর দিয়ে দেখতে চাইল অর্পণ। প্রবীর সেনগুপ্ত কি এখনো ছায়া ফেলে মঞ্জুলিকার অস্তিত্বে। মঞ্জুলিকার মেয়ের জনক ওই প্রবীর সেনগুপ্তর আতঙ্কেই কি মঞ্জুলিকা আর কলকাতা যেতে চায় না? বিয়ে ভেঙে দিয়ে, সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও মিথ্যে অপবাদের ছোবলকে আজও ভয় করে মঞ্জুলিকা?

অর্পণের জানা ছিল যে সবরকমের বৃত্তির শাসনই কাজ করে ব্যক্তিত্বের ভেতর থেকে। প্রবীর সেনগুপ্ত ব্যতিক্রমের একজন। বৃত্তিতে কলেজ লেকচারই শুধু নয় রাজনীতিতেও বেশ সক্রিয় এবং প্রভাবশালী প্রবীর সেনগুপ্ত। রাজনীতির ওই জোরদার জমিটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই কি প্রবীর অতখানি বেপরোয়া হতে পারল? নিজে নোংরা বলেই লোকটা মঞ্জুলিকার মুখের ওপর একদিন বলতে পেরেছিল, 'তোমার মেয়ের জনক অর্পণ মজুমদার।'

প্রথম দিন শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল মঞ্জুলিকা। পরে সে বুঝতে পেরেছে খেলাটা। অথচ গোড়ার দিকে প্রবীরকে অন্য এক নারীর সঙ্গে খুব মাখামাখি করতে দেখেও—ব্যাপারটা নিয়ে খুব বিব্রত হয়নি মঞ্জুলিকা। প্রবীরের ওই মেয়েঘেঁষা স্বভাবটা তার অজানা ছিল না। বরং প্রথম প্রথম স্বামীকে পরকীয় প্রেমে মত্ত দেখে সে যেন নিজেকেই নিজে ঠাট্টা করেছিল। বেচারা! তোমার কাছ থেকে ও ওর চাহিদা মেটাতে পারে না বলেই না অন্য নারীর কাছে যায়!

একদিন তো একেবারে বিছানায় বেসামাল অবস্থায় দুজনকে দেখে ফেলল। রতি দৃশ্যটি চোখে পড়ায় সে এমনই হতবাক হয়ে গেছিল যে তিন বছরের মেয়ের চোখে হাত চাপা দিয়ে আড়াল করতেও ভুলে গেছিল। তবে এর পরেই মঞ্জুলিকা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিতে পেরেছিল।

এসব কথাই সাত বছর আগে সেই শেষ দেখা হওয়ার দিনটিতে খুব সংক্ষেপে অর্পণকে বলেছিল মঞ্জুলিকা। কিন্তু তারপরই নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিল। নিজের চারপাশে মঞ্জুলিকা এমন কঠিন পাঁচিল ঘিরে নিল কেন অর্পণের জানা নেই। আত্মীয় বন্ধুজন এমনকি যে অর্পণের নাম করে প্রবীর তাকে মিথ্যায় জড়াতে চেয়েছিল সেই অর্পণের চিঠিরও উত্তর দেয়নি সে। নিজের ওপরই দুরন্ত অভিমান কি ক্রমশ নিজস্ব নির্জনতায় ডুবিয়ে নিয়েছিল?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, অর্পণ বলল 'তুমি কোনো বছরেই কনফারেন্সে আসো না। এবার এলে কেন সেটা অনুমান করতে পারি। এর এক পাণ্ডা প্রবীর সেনগুপ্ত এখন জার্মানিতে। তাই না?

'সেটা খানিকটা। পুরোটা নয়। তলায় তলায় অন্য প্রত্যাশাও ছিল।'

'অনেকবার যে প্রত্যাশাটা নিয়ে আমি এসেছি। ভেবেছি, হঠাৎ হয়তো দেখা যাবে।' অর্পণ গ্রুপ ফটোটার কথা এই মুহূর্তে বলল না।

মঞ্জুলিকা আর কথা বলল না। ম্লান হাসল শুধু।

ওরা দুজন খাওয়ার জায়গাটা থেকে সম্মেলন মঞ্চের কাছাকাছি চলে আসতেই আবার আরতি মিত্র অনুরাধা ভট্টাচার্য এবং অর্পণদের কলেজের এনথ্রোপলজির ধীরেন মুখার্জির সঙ্গে গল্প হ'ল কিছুটা। এর মধ্যে অর্পণদের ফিলজফির সুনীতা এসে বলল, 'আপনাদের খুঁজছিলাম। চলুন নদীর ধারটা ঘুরে আসি।'

কলেজ প্রাঙ্গণের পেছন দিক দিয়ে বয়ে গেছে নদী। খুব কাছে নয়, মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। কিন্তু আশ্বিনের শেষ হলেও আচমকা বৃষ্টি হানা দিচ্ছে যখন তখন। কলেজের পাশ দিয়ে পায়ে চলার পথটায় এখন বেশ কাদা। এসব আপত্তি সত্ত্বেও সুনীতার উৎসাহের সামনে কোনো কিছু টিকল না।

দিন গুটিয়ে আসছিল। হাঁটতে হাঁটতে গল্পে গল্পে ওরা এগোতে শুরু করে দিয়েছিল নদীতীরে পৌঁছবার রাস্তাটা ধরে। অনুরাধাদি বললেন, 'হাঁটায় আমার ক্লান্তি নেই ভাই, কিন্তু যে রকম কাদা থিকথিকে রাস্তা! কাদা ডিঙোতেই এনার্জি শেষ। সুনীতা হেসে বলল, তোমার বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাও কি এই রাস্তায় বর্ষাভিসার করতে চাইত না?'

অর্পণ গলা তুলে বলল, 'গাগরি বারি ঢালি করি পিছল / চলতহি অঙ্গুলি চাপি।'

অনুরাধাদি বললেন, 'ও ভাই যতই প্র্যাকটিশ করুক রাধা, উঠোনে হাজার জল ঢেলে, আঙুল চেপে যতই হাঁটার মহড়া দিক—এই কর্দমবিহার করতে গেলে নির্ঘাৎ কুপোকাৎ হতো রাধা।'

সুনীতা জবাব দিল, 'তবে রাধা যদি আমাদের মতো কলকাতার মেয়ে হতো, তবে জল কাদা ভেঙে আসতে পারতো ঠিকই। আমরা তো পারি। বর্ষায় কলকাতার বেশির ভাগ পথই তো পানিপথ এবং অধিকাংশ পাড়াই কাদাপাড়া হয়ে যায়।'

সুনীতার বলার বাহারে সবাই হেসে বাহবা দিল।

মাঠের একধার দিয়ে এগোনো পায়ে চলা রাস্তাটা পেরিয়ে নদীর তীর ধরে খানিকটা হাঁটার পর অর্পণ এক সময় চেঁচিয়ে বলল, 'ওইটার ওপর বসা যাক।'

অর্পণের কথায় বাকি সকলে সামনের দিক তাকায়।

নদীর পাড়ে পড়ে আছে একটা পরিত্যক্ত নৌকো। বালির মধ্যে বসে গেছে খানিকটা। নদীর দিকে মুখ করে ওর ওপর পা ঝুলিয়ে বসা যায় পাশাপাশি। য়ুনিভার্সিটির গ্রুপ ফটোটাতে তো সবাই পাশাপাশি বসা ধীরেন

মুখার্জি মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ—বর্ষাভিসার তো হয়েছে মোক্ষম। চলো, এবার খানিকটা নৌকাবিলাস করা যাক।' নৌকোর ওপর পা ঝুলিয়ে বসতে গিয়ে দেখা গেল নৌকোর কাঠ বেশ ভিজে। আরতিদির সঙ্গে খবরের কাগজ ছিল। কাগজ পেতে চার মহিলার বসার জায়গা করা হ'ল। ধীরেন মুখার্জি বসল রুমাল পেতে। অর্পণ বসতে গিয়ে ঈষৎ চিন্তা করল।

অর্পণের পরনে সদ্য পাট ভাঙা পায়জামা পাঞ্জাবি। সাদা ধবধবে। তার ডান কাঁধে ঝোলা। কাপড়ের ঝোলাটা সাদার ওপর সুতোর নানান কারু কাজ। সে ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রেক্সিনের মলাট দেওয়া বড়মাপের একটা ডায়েরি বার করল। নৌকোর কাঠের ওপর সেটা পেতে তারই ওপরে বসে পড়ল এবার।

মাঝনদী দিয়ে জেলে নৌকো চলে যাচ্ছে। মঞ্জুলিকাকে গান গাইতে বললেন আরতিদি। খোলা গলায় গান শুরু করল মঞ্জুলিকা। একটা নয়, পরপর তিনখানা গান গাইতে হ'ল তাকে। পরে একটা গাইল ধীরেন মুখার্জি। গানে গল্পে বিকেলটা গড়িয়ে এলো সন্ধের মুখে।

শেষ বিকেলের আলোয় আড্ডায় বুঁদ হয়ে আছে যখন সকলে তখন আরতিদিই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'সর্ব্বনাশ। বৃষ্টি আসছে। আমার হাতে এইমাত্র পড়ল এক ফোঁটা।'

'এইরে! এখানে তো দাঁড়াবার কোনো জায়গাই নেই। পুরো ভিজতে হবে। চলো, চলো, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়।' বলে ধীরেন মুখার্জিও হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অনুরাও।

আরতিদি সাবধান করে দেন সকলকে, 'দেখো, তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে আছাড় খেয়ো না আবার। সাবধানে পা ফেল।'

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দিল অর্ধেক রাস্তা পার হতে না হতেই। তবে জোরে নামার আগে সকলে নির্জন নদীর পাড় ছেড়ে, মাঠের পাড় বরাবর পথটা পেরিয়ে কলেজের সামনের পিচের রাস্তার কাছাকাছি এসে পড়ল।

একটা মিষ্টির দোকানের মধ্যে ঢুকে, তেড়ে বৃষ্টি নামা দেখতে দেখতে অনুরাধা ভট্টাচার্য বললেন, 'আর একটু দেরি করলেই কাকভেজা ভিজে যেতাম।'

বৃষ্টিটা বেশিক্ষণ থাকল না। মিনিট কুড়ি। তারপরেই আবার পরিষ্কার আকাশ। কিছুক্ষণ পর এরা সকলে কলেজ চত্বরে এলো। মঞ্জুলিকা চলে গেল আরতিদিদের সঙ্গে আস্তানার দিকে। যাওয়ার আগে অর্পণকে বলে গেল, আধ ঘণ্টা পরেই সে

চলে আসবে মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনতে। ধীরেন মুখার্জির সঙ্গে অর্পণ এগোলো তাদের ডেরায়।

আধ ঘণ্টা পরে আস্তানা থেকে সম্মেলন মঞ্চের দিকে আসতে আসতে অর্পণ রাস্তার বাঁকে একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়াল সিগারেট কেনার জন্যে। উল্টোদিকে মাঠের পাড় বরাবর নদীর পাড়ে যাওয়ার সেই পায়ে চলার পথটা।

অল্প দূরে, পথের মুখটাতেই দুটি কম বয়েসি ছেলে এবং একটি কম বয়েসি মেয়ে কথা বলছে। ময়লা ফ্রকপরা খুব অভাবী ঘরের মেয়েটা একটু হাবাগোবা। খালি পা, চুলে তেল পড়ে না কোনোকালে। বছর ষোল সতেরো হবে। ছেলে দুটো বছর চব্বিশ পঁচিশের। দুজনের পরনেই প্যান্ট আর রঙিন গেঞ্জি। হাতে ঘড়িও আছে। ওদের কথাবার্তার কয়েক টুকরো অর্পণের কানে এলো।

বোঝা যাচ্ছে মেয়েটাকে ওরা দুজনে নদীর পাড়ে নিয়ে যেতে চাইছে। একটি ছেলে বলছে, 'বেওসা করতে নেমে অতো বাদবিচার করলে চলবে? এখানে যাবো না, ওখানে যাবো না। এটা করবো না, ওটা করবো না বললে চলবে কেন?'

অর্পণ বোকা মেয়েটার দু চোখের ভয় এবং লোভ এক ঝলক দেখে ফেলল। দেখে খুব খারাপ লাগল। সিগারেট কিনে সে আর ওখানে দাঁড়াল না।

প্যাণ্ডেলের বাইরে মঞ্জুলিকা মাঝ বয়সী দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। অর্পণকে দূর থেকে দেখেই সে কথা শেষ করে এগিয়ে এলো। তখনই অর্পণের মনে হ'ল—পুরোনো গ্রুপ ফটোটা মঞ্জুলিকাকে দেবে বলে সে সঙ্গে করে এনেছে এখনও দেওয়া হয়নি। বনভোজনের ফটো। একটা গাছের শোয়ানো গুঁড়ির ওপর পাশাপাশি বসা সাতজন য়ুনিভার্সিটির ক্লাসমেট। ফটোটা ডায়েরির মধ্যে সযত্নে রাখা আছে অনেককাল। ভাবতে ভাবতেই অর্পণ তার কাঁধের ঝোলাটায় হাত ঢোকাল আর একই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল— শেষ বিকেলে সে বাতিল নৌকোটার ওপর রেক্সিনের মলাট বাঁধানো চওড়া ডায়েরিটা পেতে তার ওপর বসেছিল। নৌকো থেকে হুড়মুড় করে নেমে তাড়াতাড়ি চলে আসার সময় ডায়েরিটা তুলে নিতে খেয়াল করেনি।

'মঞ্জু। মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। তখন নৌকোর ওপর ডায়েরিটা আমি ফেলে এসেছি। আমি আসছি এক্ষুনি।' বলেই ঘুরে গিয়ে অর্পণ হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দিল।

'আরে শোনো! ওদিকটায় যেও না একা। জায়গাটা…' মঞ্জুলিকা কথাটা

বলে ওঠার আগেই অর্পণ কেমন যেন দিশেহারা হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনেকটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্জুলিকা কি করবে ভেবে পেল না। এই সময়ে তার পরিচিত আর এক অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথা বিনিময় করতে হ'ল দু মিনিট। তারপর মঞ্জুলিকা, খানিকটা যেন মরিয়া হয়েই এগিয়ে গেল অর্পণ যেদিকে এগিয়ে গেছে—সেই নদীর পাড়ে যাওয়ার নির্জন পথটা ধরে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছে অর্পণ। একপাশে ধূ-ধূ মাঠ, অন্য পাশে কাঁটা ঝোপের জঙ্গল। আগের তুলনায় মেঠো পথটা আরো বেশি পিছল হয়ে আছে। মাঠের পাড় বরাবর পথটার প্রায় শেষপ্রান্তে এসে অর্পণকে ধরতে পারল মঞ্জুলিকা।

'একী! তুমি এখানে এসেছো কেন? এখানে বিপদ হ'তে পারে মঞ্জুলিকা। তাছাড়া এখানে আমাদের দুজনকে দেখলে যে কোনো লোকের ভুল একটা ধারণা হ'তে পারে।'

'কারো ভুল ভাবা কিংবা না ভাবার ওপর আমরা কতখানি দাঁড়িয়ে আছি অর্পণ? বেশ আমি আর এগোবো না। তুমিও ফিরে চলো।'

'কিন্তু নৌকোর ওপরটা একবার আমার দেখে আসতেই হবে।'

'তাহ'লে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'এই অন্ধকার পিছল রাস্তা। আশপাশে কোনো লোক নেই। ডায়েরির মধ্যে আমাদের পিকনিকের গ্রুপ ফটো আছে বলেই ওটা আমার ফেরত পাওয়া খুব জরুরি।'

'জরুরি আমার কাছেও। ওই ছবিটা হারাতে দিলে চলবে না।' বলে এবার মঞ্জুলিকাই এগোতে শুরু করে দিল। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে কাদায় চটিটা পিছলে গিয়ে জোরে আছাড় খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু চট্ করে একটা বেঁটে খেজুরগাছের পাতা টেনে সামাল দিল পতনটা। কিন্তু কাঁটা ফুটল হাতে। অর্পণ ততক্ষণে এসে হাত বাড়িয়ে ধরেছে মঞ্জুলিকার হাত। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দুজনে একই সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছে। তখন নদীর পাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। কিছু দূরত্ব থেকে নদীর ঢালে নৌকোটা দেখতে পাচ্ছে।

এখন ভাটা। জল নেমে গিয়ে পাড়ের কাদা বেরিয়ে পড়েছে। মধ্যে এখানে

ওখানে গর্তের ভেতরের জল চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। ওরা দুজনেই স্পষ্ট দেখতে পেল স্থির নৌকোর ওপরে, নৌকোর পায়ের দিকটায় অস্থির দুটো শরীর। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আর একটি যুবক কোমরের বেল্ট ঠিক করছে।

অর্পণ আর মঞ্জুলিকা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর এক পা-ও এগোতে পারছিল না। অর্পণ নৌকোর ওপরের তিনটে শরীর চিনতে পেরেছে।

একটু পরে দ্বিতীয় যুবকটিও নেমে গেল নৌকোর ওপর থেকে। মেয়েটি ততক্ষণে উঠে বসেছে এবং নৌকোর ওপর থেকে অর্পণদের দেখতে পেয়েছে। ছেলে দুটিও দেখল তাদের। তারপর নিজেদের মধ্যে বেপরোয়া কাঁচা রসিকতা করতে করতে এগিয়ে গেল অর্পণ আর মঞ্জুলিকাকে পেরিয়ে।

অর্পণরা যাতে শুনতে পায় এমন জোর এবং কর্কশ গলাতেই একজন বলল বিশ্রী রকম হেসে, 'সব বান্দার এক ধান্দা মাইরি।' অন্য ছেলেটি বলল, 'আমরা না হয় লোফার কেলাস। মালের টাকা জোগাড় করতেই ফতুর। এই ভদ্দর লোকের বাচ্চাগুলো কি মাইরি এক ঘণ্টার ঘরও ভাড়া করতে পারে না?'

বোকা লোভী অভাবী মেয়েটি তখন ছেলে দুটির পেছন পেছন এগোচ্ছে। সে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে, বাড়তি পয়সা চাইছে। তার পুরোনো ফ্রকের অনেকটা ছিঁড়ে গেছে বুকের কাছটায়।

ছেলে দুটো মৌজ করে সিগারেট ধরিয়ে খুব তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে অর্পণ মঞ্জুলিকার দিকে দেখল আর একবার। একজন বলল, 'শালাদের শখ আছে পুরো, কলজেতে সাহস নেই একচিল্‌তে।' সংকোচে কুঁকড়ে যেতে যেতে অর্পণ আর মঞ্জুলিকা নৌকোর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল! আর তখনই নজরে পড়ল— নৌকোর মাথার দিকটায় রেক্সিনে বাঁধানো ডায়েরিটার ওপর চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে।

গান আমার

পিনাকী ভাদুড়ী

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে পঞ্চাশ বছর কেটে যেতে আর খুব দেরি হবে না। সামনেই ১৯৯১ সাল, তখন রবীন্দ্ররচনার কপিরাইট চলে যাবে। তখন কি হবে তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। সবচেয়ে বড়ো আশঙ্কা হয়েছে তাঁর গান সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গানের বিষয়ে স্পর্শকাতর ছিলেন। বলেছেন, এমনভাবে গেয়ো যেন আমার গান বলে চেনা যায়। বলেছেন, আমার গানে স্টিম রোলার চালিও না। বলেছেন, আমার গান বাঙালিকে গাইতেই হবে।

গীতবিতানে 'প্রেম' পর্যায়ের মধ্যে একটি গান আছে—'গান আমার যায় ভেসে যায় / ওরে চাসনে ফিরে দে তারে বিদায়। সরাসরি কোনো প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমকথা এতে নেই, এতে আছে গানের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য ভালবাসা। গানটির শুরুতে বলা হয় যে আমার গানকে বিদায় দিতে হবে, তথাপি শেষ পংক্তিতে একটি সূক্ষ্ম কামনা আর্তনাদ করে ওঠে—'উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।' ফিরে আসবে সেই গান, এই হল সেই আশা ; বাঙালিকে আমার গান গাইতেই হবে, এই হল সেই বিশ্বাস।

এই অনুভূতিই ছিল রবীন্দ্রনাথের, এই আনন্দ নিয়েই তিনি গান বানিয়ে তুলতেন। এও সত্যি কথা, আমরা বাঙালিরা এই গান প্রচুর পরিমাণেই গাই। যে গাইতে পারে সে তো বটেই; যে গাইতে পারে না, সে-ও গুণগুণ না করে পারে না। এখন অলিতে গলিতে এই গান শেখার ব্যবস্থা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী বা শিক্ষকরা অনেকেই সসম্মানে উপার্জন করে সমাজে বাস করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে কপিরাইট চলে গেলে এ গানের ভবিষ্যৎ কি হবে? অনেকে বলছেন তখন যা খুশি গাওয়া হবে এ গান, সুরের বিকৃতি ঘটবে, কথাও ঠিক থাকবে না। তাহলে দেখা যাক, কপিরাইট যখন যায়নি তখন, অর্থাৎ এখন অবস্থাটা কেমন আছে।

রবীন্দ্রসংগীত গায়কদের মধ্যে, অন্যতম বিশিষ্ট পুরুষ হলেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর রেকর্ড করা অসংখ্য গানের একটি হল 'যখন ভাঙল মিলন

মেলা / ভেবেছিলেম ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা'। গানটির দ্বিতীয় স্তবকে আছে, 'দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল / ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চক্ষের জল।' গানটি যখন শেষ হয় তখন কিন্তু দেখা যায় যে জল ঝরবে না বললেও হঠাৎ দেখার আঘাতে আবার চোখ ফেটে জল এসেছে। বুঝতেই পারা যায়, দ্বিতীয় স্তবক যে আপাতদৃঢ়তা দিয়ে শুরু হয়, তা ভেঙে পড়ে গানের শেষের দুই কলিতে। হেমন্তবাবু কিন্তু অবলীলায় দ্বিতীয় স্তবকে গাইলেন, 'দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল / ভেবেছিলেম ভুলব না আর আমার চক্ষের জল।' 'ঝরবে না' হয়ে গেল 'ভুলব না'—গানের মানেটাই মার খেয়ে গেল। এই রেকর্ড কপিরাইট অনুসারে অনুমতিক্রমেই চলছে। হেমন্তবাবুর আরো একটি গান 'যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে'—তার মধ্যে 'চপল লীলা ছলনা ভরে / বেদনখানি আড়াল করে,' এই জায়গাটি হেমন্তবাবু গাইলেন '···ছলনা ভ'রে / ···আড়াল ক'রে'—এও রেকর্ড হয়েছে। ভরে' আর 'ভ'রে' যে এক নয় তা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না।

এরকম উদাহরণ আরো দেওয়া যায় যাতে বোঝা যাবে যে বিকৃতি শুধুমাত্র কপিরাইটের উপরেই নির্ভর করে না। 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' গানটিতে 'এক তুমি' অংশটি ঋতু গুহ গাইছেন 'য়েকো তুমি' বলে। 'আমি চঞ্চল হে' গানটির 'আছি এক ঠাঁই' অংশটি দূরদর্শনে অভিরূপ গুহঠাকুরতা গাইলেন 'য়েকো ঠাঁই' বলে। অবশ্য গানের অনুভূতি তাঁর গলায় খুলেছিল।

এইরকম কাণ্ড এখনো ঘটে থাকে। ১৯৯১ সালের পরেও এই রকমই ঘটবে। তাতে কোনো বিশেষ পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা নেই। কেউ তখন নতুন করে রবীন্দ্রসংগীত লিখবেন এরকম মনে হয় না। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি মানুষ কম হোক, বেশি হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক, আকৃষ্ট হচ্ছেই। এজন্য এই গানের বাণী বা সুরের ছাপ অজান্তেই কিছু না কিছু আমাদের উপরে পড়ছে। তবে যে ধরনের ভুল বা অন্যমনস্কতা এখন দেখা যায়, তা তখনো দেখা যাবে। 'সূর্য পাটে নেমে / সুবাতাস যাবে থেমে'—এই পঙ্‌ক্তি গাইবার সময়ে অর্ঘ্য সেন 'সুবাতাস' শব্দটা উচ্চারণ করেন 'সুবাতাসো' বলে। অনেকটা সুবাতাসও শোনায়—যেন অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে সুবাতাসটাও থেমে যাবে, এইরকম মনে হয়। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে শ্রোতাদের মন্তব্য সংকলন করে দেখিয়েছেন যে জাতীয় সংগীতে 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা' অংশটি গাওয়া হয় 'পাঞ্জাব ও সিন্ধু গুজরাট

ও মারাঠা' বলে। 'একটি মুঠি' অনেকেই গান 'য়েকোটি মুঠি'। উচ্চারণজনিত এই দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মধ্যেও রয়েছে, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতিও এ থেকে মুক্ত নন। হয়তো এই দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব বাংলা ভাষারই অঙ্গ। 'তবু মনে রেখো' এই গানটির তিনটি পরিবেশিত রূপ পরীক্ষা করলেই তফাৎটা বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ গানটি রেকর্ড করেছেন, সুচিত্রা মিত্র এবং নীলিমা সেনও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'একদিন যদি খেলা থেমে যায়' গেয়েছেন, 'এ্যাকোদিন' বলে, 'ছলছল জল' উচ্চারণ করেছেন 'ছলোছলো' জলো বলে। সুচিত্রা মিত্র এবং নীলিমা সেন কিন্তু 'একদিন' এবং 'ছলোছলো জল' বলেছেন। সুরের দিক থেকে অল্পস্বল্প তফাৎ ঘটেছে তিন-জনের গানে। সেসবের ব্যাকরণগত রূপ দেখানো যাবে না, দরকারও নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথের গানের লক্ষ্য কিন্তু গানের পণ্ডিতরা নন, সাধারণ মানুষ। 'ঘরে ঘরে কত শত নরনারী চিরকাল ধরে পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে কিছু কি রব না আমি'—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যই এখনো তাঁর গান আমাদের এত বেশি বিচলিত করতে পারে। বিপ্লবী দীনেশের যখন ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, তখন তাঁর হৃদয়ে চলে যাওয়ার যে গান বেজেছিল, সেটি হল 'আমার দিন ফুরালো'। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই গানই কি তাঁকে শক্তি জুগিয়ে দিয়েছিল?

এসবের অবশ্যম্ভাবী ফল হল যে তাঁর গানের বাণিজ্যিক ব্যবহারও হবে। তা হচ্ছেও, ১৯৯১ সালের পরে হয়তো আরো বেশি হতে পারে। আমি অনেক বছর আগেই কারুকে রেস্তোরাঁয় গায়িকাকে মাইক হাতে 'আগুনের পরশমণি' গাইতে শুনেছি। গানটি অবশ্য ভুল গাওয়া হয়েছিল, 'এ জীবন পুণ্য কর' এই পঙক্তিটি 'এ জীবন পূর্ণ কর' বলে গেয়েছিলেন গায়িকা। আপাতত বাজার চড়ে যাওয়ায় রেস্তোরাঁয় যেতে পারি না, জানি না এখন অবস্থাটা কি, তবে এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে এসব জায়গাতে রবীন্দ্রসংগীত গাইলে চলবে, কেউ রে রে করে তেড়ে আসবে না।

আমি একটি কারখানায় আজীবন কাজ করলাম। সেখানে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন মেসিন শপের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটু জোরে গান শুনতে পেলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম যে ঐ মেসিনগুলির পাশ থেকে একজন ওস্তাদ কারিগর বেরিয়ে আসছে, মেসিনের তেলে তার সারা

শরীর আচারের মতো হয়ে গেছে, কিন্তু সে গাইছে—'যৌবনসরসীনীরে', আমাকে দেখতে পেয়ে একটু যেন অপ্রস্তুত হল, বলল, গানটা বেশ সুন্দর। এইভাবে সর্বস্তরে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে। আগে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন না, তাঁরা অনেকে গাইছেন। হিন্দী গানের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের দিয়ে এ গান গাওয়ানো হয়েছে। লতা মঙ্গেশকর, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে—এঁরা বেশ কিছু রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন। দু-একটা উচ্চারণগত ভুল নিশ্চয় আছে, কথনো বা গানের অনুভূতি সুস্পষ্ট হয়নি, তথাপি এঁরা যত্নের সঙ্গেই গান গাইবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের পরিশীলিত কণ্ঠ গানের প্রচারে সাহায্য করেছে। আমি একটি ২৫শে বৈশাখের দিনে সমস্তক্ষণ কিশোরকুমারের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট বাজতে শুনেছি। সেসব এমন জায়গায় বেজেছে যেখানে অন্য দিনে হিন্দী গান ছাড়া কিছুই বাজে না। কিশোরকুমার যেমনই গেয়ে থাকুন-না কেন, রবীন্দ্রসংগীতকে আরো ছড়িয়ে দেবার জন্য এই ক্যাসেটের প্রয়োজন ছিল। এক সময়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতকে ছড়িয়ে দেবার জন্য পঙ্কজকুমার মল্লিক সিনেমার সাহায্য নিয়েছিলেন। সেসব ছবিতে পাহাড়ী অশিক্ষিত মেয়ের গলায় রবীন্দ্রসংগীত বাস্তব-সম্মত হয়েছে কি হয়নি, সে তর্কে না গিয়েও এটুকু বলা যায় যে ঐ গান তখন দর্শকসমাজে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তখন কুন্দনলাল সাইগল বেশ কিছু রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ড করে গিয়েছেন। তাঁর গাওয়া 'আমার রাত পোহালো' বা 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান', আজো আলোড়ন জাগায়। অনেকের শান্তা আপ্তের গাওয়া 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' এই গানটির কথা মনে পড়বে। সাবিত্রী কৃষ্ণান অবশ্য শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দীতেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিলেন, তবু তাঁর গাওয়া 'নীলাঞ্জনছায়া'র কোন দোসর খুঁজতে গেলে শুধু সুচিত্রা মিত্রেরই নাম করতে হবে। তখনই এই যেসব অবাঙালি গায়ক-গায়িকা নানাভাবে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, আজো তেমনি জনপ্রিয় হিন্দী ছবির গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে এর প্রসার ঘটছে। যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষিত শিল্পী তাঁরা এর মান বৃদ্ধি করেছেন, তথাপি পাশাপাশি এই কাজটিও বোধহয় প্রয়োজনীয় ছিল।

বিষয়টিকে এদিক থেকেই ভাবতে হবে। ১৯৯১ সালের পরে আরো বেশি নির্দ্বিধায় অনেকে হয়তো এ গান গাইতে আসবেন—তার মধ্যে বাণিজ্যিক লোভের ছাপ পড়লেও ভালোবেসেও এ গান গাওয়া হবে। হবেই, তার কারণ এই গানের

মধ্যেই আমাদের ভালোবাসার পরীক্ষা হয়ে যায়। কেউ কেউ হয়তো তাল বা লয় ইত্যাদির বিস্তার বা অনুরণন কিছুর চেষ্টা করবেন। এ নিয়ে অনেকবার অনেক তর্ক হয়ে গেছে। আমার মনে পড়ছে 'তুমি রবে নীরবে' গানটিসম্পর্কে ইন্দিরা দেবীর একটি মন্তব্য। গানটিতে 'হৃদয়ে মম' পঙক্তিতে 'মম' শব্দটিতে খুব সম্ভব চার মাত্রার একটি কাজ বা গমক থাকে। কিন্তু সেটি এমনই শ্রুতিমধুর হয় যে ইন্দিরা দেবী বলেছিলেন এই গান গাইতে গিয়ে গায়কের এই লোভ হতেই পারে যে ঐ চার মাত্রাটি বাড়িয়ে ছয় করে দিই। এরকম বদল যে কেউ কোথাও করেন না এমন নয়। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' যিনি শুনেছেন তিনি জানেন এর মধ্যে 'আরো প্রেমে, আরো প্রেমে / মোর আমি ডুবে যাক নেমে' অংশটিতে 'আমি' শব্দটিতে এমন বিশেষ ঝোঁক দিতেন তিনি যার ফলে গানটি নতুন মাত্রা পায়। কিন্তু এই দেবব্রতবাবুই নাকি 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে' গানটি এমন লয় বাড়িয়ে গেয়েছিলেন যে ওটিতে অনুমতি দেওয়া যায়নি। এরকম ঘটে এবং ঘটবে। তবু বোধহয় বাঙালির হৃদয়ে যা সাড়া জাগাবে না তা শেষপর্যন্ত চলবে না।

অনেক সময়ে সামান্য পরিবর্তন সুখকর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গাওয়া 'তবু মনে রেখো'র মানবিক আর্তি আমাদের অভিভূত করে দেয়, মনে হয় এর পরে আর কিছু বলার থাকতে পারে না—আবার সুচিত্রা মিত্রের 'মনে রেখো'তে 'রেখো' শব্দটাকে বেশি দূর টেনে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা আবেদন সৃষ্টি করা হয়। যেন 'রেখো', এই করুণ অনুরোধটা শিল্পী পৌনঃপুনিকভাবে করে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর কোনো কোনো গানের স্বরলিপির পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর মৃত্যুর পরে এমনটি আরো অনেক হয়েছে। এ নিয়ে কম তর্ক এবং কলহ হয়নি। অনেক সময়ে গানগুলির স্মৃতি থেকে স্বরলিপি তৈরি করতে গেলে এরকম হয়ে থাকতে পারে। কোথাও বদল ঘটতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে। যিনি লিখেছেন বা যিনি গেয়েছেন, উভয়েই পরবর্তীকালে সুরটি ভুলে গিয়েও থাকতে পারেন, যদিও তাঁরা নিজেরা হয়তো সে বিষয়ে সচেতন নন। বোধ হয় এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ গানে সুর দিয়েই সেটি নথিভুক্ত করে ফেলতে চাইতেন। প্রমথনাথ বিশীর বর্ণনায় আছে যে 'নিভৃত নীল পদ্ম লাগি' গাইতে গাইতে রবীন্দ্রনাথ মাঠ ভেঙে দ্রুত চলেছেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে, তাড়াতাড়ি সুরটা শিখিয়ে দেবার জন্য।

এই ধরনের পরিবর্তন হয়তো ঘটে যাবে! অসংখ্য লোক গাইবেন, এখনো

গাইছেন, যাঁরা স্বরলিপি পান না বা অত মেহনত করতে চান না, তাঁরা শুনে শুনে শেখেন, রেডিওতে অথবা কোনো শিক্ষকের কাছে। এসব শিক্ষক সর্বত্র আছেন। কলকাতা বা শান্তিনিকেতনের সীমানার বাইরে দুর্গাপুর, আসানসোল, উত্তরবঙ্গ, অথবা বাংলার বাইরে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত শিখতে চান তাঁদের এঁরাই শেখান। ভারতের বাইরে সুদূর আমেরিকাতেও এখন প্রবাসী বাঙালিরা এ গান শেখেন। হয়তো অবাঙালি বা ভারতীয়ও কেউ কেউ শিখতে পারেন। সেখানে একটু প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে শিক্ষক সারা সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্লেনে করে পৌঁছে গিয়ে গান শিখিয়ে আসেন। এঁরা সবাই যে প্রশিক্ষণ পান এমন নয়, ফলে এঁদের শেখানো গানে ভুলচুক থাকতেই পারে। 'সংগীত প্রভাকর' নামে একটি পরীক্ষা চলিত আছে, তার মান সন্দেহজনক। তবু সে পরীক্ষায় পাস করে অনেকে শিক্ষকতা করছেন। আমাদের পাশেই বাংলাদেশ। তাঁরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁরাও শিখবেন কোত্থেকে? রেকর্ড বা স্বরলিপি, উভয় বস্তুতেই বদল হয়ে যায়, সুতরাং তাঁরাও যা শিখছেন তার নির্ভরযোগ্যতাও সংশয়ের অতীত নয়।

তবু এইভাবেই রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া শুরু হবে। এ গান না গেয়ে আমাদের উপায় নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ত্রুটি এসে পড়তে পারে, তবু সামগ্রিকভাবে এ গান আমাদের জীবনকে উন্নত করবে। এখনও রেডিও বা টেলিভিশনে প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে যে সমস্ত শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে থাকেন, তাঁদের অনেকেই হতাশ করেন, তবু এ গানকে আবদ্ধ করা যাবে না। কারণ এঁরাই কেউ কেউ আবার আশা জাগিয়ে তোলেন। আমার এক বন্ধু রণজিৎ—সে সারাজীবন কারখানাতে জীবিকার উন্নতি খুঁজে বেড়াল, কিন্তু একটি অফিসের পার্টিতেই সে যখন 'প্রভু আমার প্রিয় আমার' গানটি গেয়েছিল তখন কেউই মুগ্ধ না হয়ে পারেনি, ও গান রণজিৎ আর গাইতে পারবে না। রবীন্দ্রসদনের মাঠে একবার শান্তিদেব ঘোষের মুখে 'কৃষ্ণকলি' শুনেছিলাম। 'আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে / আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে', এই পঙক্তি যখন গেয়েছিলেন তিনি, তখন সমস্ত দর্শক স্বতঃস্ফূর্তভাবে একযোগে গুঞ্জন করে উঠেছিল। পঙক্তিটির মেজাজটি এমনই প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন, কিন্তু ঐ গানই শান্তিদেব ঘোষ ঐরকমটি আর গেয়েছেন কিনা বলা মুশকিল। সুচিত্রা মিত্র রাশিয়ায় গেয়েছিলেন 'চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে'—এ গানের ভাষা সেখানে কেউ বোঝেনি। কিন্তু

গানের শেষে তারা উঠে এসে জানতে চেয়েছিল – It is about the rains ? ঐরকম ভাবে গানের মেজাজ সুচিত্রা মিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

এখন কিন্তু এঁদের উত্তরসূরী হবার পূর্ণ যোগ্যতা কার আছে বলা শক্ত। কটা নির্বাচিত গান শিখে ডিপ্লোমা পেয়েই সবাই চাইছেন রেডিও টেলিভিশনে গাইতে। গানের মানে সবাই বুঝছেন এমন নয়, কথাগুলো অনেকে মুখস্থ পর্যন্ত করতে পারেন না। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী 'শ্যামা'র গলায় যিনি 'শ্যামা ডাকিতেছে তারে' এই বলে সব ভুলিয়ে দিতে পারতেন, তিনিও গাইবার সময়ে গানের খাতা থেকে চোখ তুলতে পারেন না। এতে গানের আবহ তৈরি হতে পারে না, কারণ দেখে গাইতে গিয়ে ঐ দেখার দিকেই মনটা ঝুঁকে থাকে। শান্তিনিকেতনে এখন গেলে রবীন্দ্রসংগীত কানে আসে কম – ক্যাসেটে বাজে হিন্দী গান।

একই গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে আলাদা শোনাতে পারে। শিল্পীর গাইবার ধরনের ওপরে নির্ভর করবে এটি। কেমন করে কোন শব্দে তিনি ঝোঁক দেবেন, কোন লয়টি কেমন প্রলম্বিত করবেন, তা গানের মেজাজ প্রকাশ করবার উপাদান হয়ে দাঁড়াবে। একই গান একই শিল্পী দু'জায়গায় গাইলে তাতে তফাৎ দেখা দিতে পারে। কোনো সংগীতসভায় অথবা কোনো শোকসভায় গাইলে, দু'জায়গায় একই গানের নিবেদনের ভঙ্গি বদলে যাবে। লয় বেড়েও যেতে পারে, কমেও যেতে পারে। ঘরোয়াভাবে কাউকে গান শোনালে উচ্চারণ যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, হাটের মধ্যে সেই গানই তেমন আন্তরিক না-ও শোনাতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতের বেলায় এ কথাগুলো বিশেষভাবে সত্য, কারণ এর বাণীর আছে গাঢ়তা, সুর ও ছন্দের আছে আলাদা স্বকীয়তা। 'রক্তকরবী'তে বিশু যখন 'তোমায় গান শোনাব' গায় তখন তাকে খেয়ালে রাখতে হয় যে গানটা শুধু নন্দিনী শুনলেই চলবে না, দর্শক আসনের শেষ সারিতেও এ গান পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু ঐ গানই যখন কেউ একলা তার বান্ধবীকে শোনাতে চাইবে, তখন তার নিবেদন হবে মৃদু এবং মর্মস্পর্শী। গানের ছন্দ নিবেদনের ওপরেই আশ্রয় করে থাকে।

এছাড়া এই গানের সংগতের চেহারাও পাল্টাবে। সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রসংগীতের মেজাজ বুঝে সংগত তৈরি করতে বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে বঙ্কিমের উপন্যাসের মতো রবীন্দ্রনাথের গানের জাতটাও ইউরোপীয়। ভারতবর্ষে এই গান বোধহয় অভিনব। সেদিক থেকে এর সংগতের পরীক্ষাও নানারকম হতে পারে।

যেসব গানের সুর পাওয়া যায় না, কেউ তাতে সুর দিতে যাবেন হয়তো, কিন্তু তা যদি ঘরানার সঙ্গে না মেলে, তবে তা স্থায়ী হবে না।

আসল কথা হল, এই গান ক্রমশ দেশে এবং সমাজে সর্বস্তরে প্রবেশ করে যাবে। তাতে কোথাও কিছু বদল হতে পারে। তবু এ গানের একটি প্রথাগত রীতি বর্তমান আছে, সুতরাং কোন বড়ো পরিবর্তন হবে না। তবে যেটি প্রয়োজন সেটি হল এ গানের জগতে বুদ্ধিমান, সংস্কৃতিমান শিল্পীদের আগমন নিশ্চিত হওয়া চাই। তার পরিচয় এখনো পাওয়া যাচ্ছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। সুবিনয় রায়ের ছাত্রেরা তাঁর মতো করে 'বসে আছি হে' গাইতে পারছেন কি ? নাকি তাঁরা শুধু নানা অনুষ্ঠানে গেয়ে চলেছেন !

এ গান ভালো করে গাইতে গেলে গানের বাণী এবং ছন্দের উপরে নজর রাখতে হবে। যেমন করে মানুষ কাউকে মনের কথা শোনায়, তেমনিভাবে গাওয়া চাই। 'চণ্ডালিকা'তে রবীন্দ্রনাথ একেবারে রোজকার কথা বলাকেই গানে গেঁথে দিয়েছেন, আমাদের কাজ শুধু সেইটিকে অবিকল ধরতে পারা। 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে' – এই গানে পরের বাঁশিতে একটি 'ই' যোগ করে গানের ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়েছে। বাঁশি জানে, প্রথমে এইটুকু বলে তারপরেই বলতে হল, বাঁশিই জানে। অর্থাৎ বাঁশি ছাড়া আর কেউ জানে না। এক্ষেত্রে এই 'ই' টা পরিষ্কার উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। 'আমার সকল রসের ধারা / তোমাতে আজ হোক না হারা', গানে 'তোমাতে' শব্দটির সুরের প্রক্ষেপণে সমর্পণের ভঙ্গি থাকতে হবে, তবেই হবে এটি অর্থবহ।

গান লিখেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতেন, এ গান গাইতেও যদি আমরা সেইরকম আনন্দিত হই, তবেই এ গান গাওয়া সার্থক হবে।

আবার যদি ইচ্ছা কর

মীণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

আজ ভরা ভাদ্রে ইছামতী টালমাটাল—ওপারেতে কালো রঙ / বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম, জানলার কাঁচে জলছবি আর অরুন্ধতীর মন আনমনা। এমন মন কেমন করা দিনে মনের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া কি-ই বা করা যায়। ভিজে কাপড়গুলো ডাঁই হয়ে পড়ে আছে—না খেলিয়ে দিলে সোঁদা গন্ধ বেরোবে—বেরোক্‌গে। নিজের বলতে কি কোনো সময় ওর হাতে থাকবে না? কেউ এসে বলার নেই—এ মাসটা থাকো দিদি কেঁদে ককিয়ে / ও মাসেতে নিয়ে যাবো পাল্কি সাজিয়ে। মন ভার হয়ে ওঠে, কতকাল ধরে সে আর সংসারের গিন্নী হয়ে থাকবে? চাল ধোবে, রান্না করবে, কাপড় কাচবে, টাকা পয়সার হিসাব করবে আর সকলকে দেখাশোনা করার অফুরান দায়িত্ব নেবে? আজ সে সংসারের কাজ থেকে ছুটি চাইল নিজের কাছে—বিকেলের আটা মাখা, তরকারি কোটা, বিছানা ঝাড়া, ছেলের হোমটাস্ক দেখা সব পড়ে রইল—অরুন্ধতী গালে হাত দিয়ে ছেলেবেলার কথা ভাবতে বসে। ঢাকা বারান্দায় বসে লতিয়ে ওঠা মাধবীলতার টুপটুপে জল নখের ডগায় ধরতে ধরতে তার মনে হয় আকাশজোড়া কালো মেঘে উড়ে চলে এসেছে যেন শৈশব-কালের সেই অঝোর ধারা বৃষ্টি—নারকেল সুপুরির পাতা ধরে সারারাত যার জল টুপটাপ করে ঝরে চলতো।

সামনে বড়ো দালান দেওয়া দেশের সেই বাড়িটার ঝাপসা হয়ে আসা ছবি চোখের সামনে যেন পরিষ্কার দেখা যায়—যার সামনে দিয়ে পামগাছের সারি দেওয়া রাস্তা ধরে গেলেই পাওয়া যাবে দিঘির মতো কালো পুকুর। টলটলে জলে মাছের বুড়বুড়ি, ঘাটের রানার নিচে কুচো মাছের ভীড়। পুকুরঘাটে লালপাতা-ওয়ালা বাদামগাছটা, অন্যমনস্ক পথ চলার সঙ্গী ঝুমকো জবা ফুলগুলো। সেগুলো কি এখনও ফোটে? মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে নারকেলের গাছে ফিনিকফোটা জ্যোৎস্না কি এখনও রূপকথার চাঁদের বুড়ির দেশে নিয়ে যায়?

একটা হারিয়ে যাওয়া চাবিকাঠি যেন জলের তোড়ে ভেসে এসেছে আর সেই

চাবিটা স্মৃতির সোনার কৌটোটা খুলে দিয়েছে হাট করে। দালানবাড়ির সামনে চণ্ডীমণ্ডপে বসে গুটিখেলার আবছা স্মৃতি ভেসে উঠতে আনমনা হয়ে সেকালের মতো মাধবীলতা ফুলগুলো কুড়িয়ে বিনিসুতোর মালা গাঁথতে গাঁথতে অরুন্ধতী ভাবে—ভাগ্যিস আজ বাড়িটা ফাঁকা।

দেশ ছেড়ে কবে এসেছিল মনে নেই—দাঙ্গার কোন স্মৃতি নেই। শ্যাওলা ধরা বিস্মৃতি সরিয়ে শুধু মনে পড়ে ছোটবেলায় হিন্দু-মুসলমানের তফাত বলতে বুঝত ওদের ঈদের চাঁদ—আমাদের কোজাগরী পূর্ণিমার। ওদিকে সিমাই-এর পায়েসের নেমন্তন্ন আর বাড়িতে নারকেল নাড়ু। দুই চাঁদই সুন্দর লাগত—সুন্দরের তো কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। বাবা দেখাতেন সুপুরী গাছের মাথায় একফালি বাঁকা চাঁদ—ঐ নাকি ঈদের চাঁদ, আকাশে তখন হালকা মেঘ ফুলে ফেঁপে উঠে শিবের জটার মতো ছড়িয়ে আছে—ঠিক যেমন ছবিতে দেখা যায়। কি সুন্দর! মুগ্ধ হয়ে যেত সে, কিন্তু এই মুগ্ধতার গল্প করতে গেলেই সবাই বলতো কি বোকা! কি কি বোকা! ও তো শুধু মুসলমানরা দেখে। এমন দুর্ঘটনা তো আরো ঘটেছে—গ্লোরিয়া বন্ধুদের নিয়ে ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে হো হো করে হাসত, 'গির্জার ঘণ্টা শুনলেই মেয়েটা ছুটে আসে কেন রে? ও বলে হিন্দু—দেখে ঈদের চাঁদ আবার গির্জায় এসে ঘণ্টা বাজায়। ওর জাত নেই।' অরুন্ধতী গোমড়া মুখে চলে এসে ভাবত—জাত কি করে থাকে! বাবা বলতেন, 'সেটা একটা ভূত, তার জন্য দেশ দু'ভাগ—খুনোখুনি দাঙ্গা—ভিটেমাটি ছেড়ে কত লোকের পথে নামা, এ ভূত ঘাড় থেকে তাড়ানো চাই।' তারপর ছড়ার বই খুলে ছড়া শেখাতেন—'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো / তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো'

দিন যায়। সুখের দিনগুলোকেও সময় যেন সঙ্গে নিয়ে যায়। নগরে দিন কাটে। রাতে জ্যোৎস্না দেখে না, সকালে সূর্য ওঠা দেখে না। হীরের কুচি ভরা তারার মেলা দেখে না। নদীর কূল ডোবানো তুমুল বৃষ্টি দেখে না। শীতের হিম আর কুয়াশায় মাখামাখি সবজির ক্ষেত দেখে না। ঘসা আকাশ, ধোঁয়াটে বাতাস বিবর্ণ অনুজ্জল দিনরাত বয়ে নিয়ে আসে কেবল। ভুলতে ভুলতে ছেলেবেলা কাবার। হঠাৎ হঠাৎ রাতে যেন বুকে ওঠে নিশির ডাক—নারকেল সুপারীর জঙ্গল, পুরোন ঘাটের রাণা আর বুড়ো দোতলা বাড়িটা নিশি হয়ে ডাক দেয়। তার ডাক এলেই পরদিন অরুন্ধতী আনমনা। দিনের কাজে গাফিলতি। স্বামী-সন্তানের সেবাযত্নে

হাজারো ত্রুটি। বিড়ালে দুধ খায়, কাকে মাছ নেয়, ভাত নামাতে গেলে আচমকা কলাপাতায় ঢালা ফেনাভাতের গন্ধ নাকে আসে। শীতের সকালে সকলের সঙ্গে মাটির দাওয়ায় বসে ফেনাভাত দিয়ে থলসে মাছ ভাজা বোধহয় জগতের সেরা সুখাদ্য—ওর মনে হয়। হঠাৎ ভাতপোড়া গন্ধে চটকা ভাঙে। পরিজনেরা খেতে বসে রাগ করে। ছেলেমেয়েরা বকুনি দেয়—'এই এক বাই হয়েছে, দেশ আর দেশ। ওটা তো এখন বিদেশ! কবেকার কোন্ ছেলেবেলায় দেখা অল্প সময়ের সেই বিদেশটাই বড়ো হয়ে তোমার এতদিনের দেশটাকে তুচ্ছ করে দিল? ও আকুল হয়ে ভাবে ওরা তো ঠিকই বলেছে। কেন যে এমন হচ্ছে, সত্যিই তো এই মন কেমন করার কোন যুক্তি নেই। আসলে ও বোধহয় মনে মনে আশ্রয় চাইছে—নির্ভরতা চাইছে, শৈশব-সন্ধান তাই এত জরুরী। খোলা মাঠে আর জঙ্গলে অবাধে চরে বেড়াবার ছেলেমানুষী ইচ্ছায় ও কল্পনার আঁচল ধরেই বোধহয় কর্তব্যকর্মকে ফাঁকি দিচ্ছে। অবশেষে 'গল্প হলেও সত্যি' হবার মতো ঘটনা ঘটে। দেশের ছেলে হায়দার বেড়াতে এসেছিল পশ্চিম বাংলায়। এক অনুষ্ঠানে পরিচয় বেরিয়ে পড়াতে উৎসাহ যোগায়—আমাদের ঐ দিকেই তো আপনাদের বাড়ি, চলেন দিদি একবার দেশ দেখে আসেন, আমি নিজে আপনারে নিয়ে যাবো।

—সত্যি! হায়দার তুমি আমার গত জন্মের ভাই ছিলে।

—গত জন্মে কেন দিদি, এ জন্মেই তো ভাই হয়ে গেলাম।

সে দিনগুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না জেনেও স্মৃতিকে আরো নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার তাগিদে ও একবার সেই ভিটেবাড়ি দেখার জন্য অধীর হয়। শৈশব যার কাছে বাঁধা আছে, সে নীরব হলেও সাক্ষী তো বটে। নিয়মকানুনের অনেক জাল জটিলতা পেরিয়ে ছেলেবেলার নিরাপত্তা-মোড়া সেই বাড়িটি দেখতে অবশেষে অরুন্ধতী গিয়েছিল নতুন পাওয়া ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে।

পথ চেনে না ভালো করে, পথ নির্দেশটাও বলতে পারছে না, ভরসা আছে খুঁজে পাবেই। জনে জনে জিজ্ঞাসা করে—

—রায়বাবুদের বাড়িটা কোন দিকে? এখনও আছে?

—কে ডা? রায়বাবুগো বাড়ির কেউ নাকি? উই সাবু গাছের বাড়ি তো? থাকবে না কেন? উই সিদে পথ ধরে হাঁটেন—

—সে বাড়ি কি এখন আর আছে? এখন সব জঙ্গল। সঙ্গে কিছু উদ্যোগী পথপ্রদর্শক স্বেচ্ছায় সঙ্গ নেয়।

পথচলতি আর একজন দেখায়—উই যে ওপাশে ইস্কুল দেখতিছেন—বড়বাবু তৈরি করিলেন—এই খেলার মাঠে সেজবাবু—খুব খেলাধুলো ভালবাসতেন তো—তা ফুটবলের কেলাব করিলেন। রায়কর্তা চোখ বোজলেন—তেনারা সব ওপার গ্যালেন, গেরামের বাড়বাড়ন্তেরও নিদেনকাল হল।

আচ্ছন্ন অরুন্ধতী স্বপ্নের ঘোরে এগোয় পায়ে পায়ে। আচমকা একটা সরুপথ গাছগাছড়ার মধ্যে থেকে উঁকি মেরে যেন ওকে আদর করে ডেকে নিল। স্মৃতি দেখাল তার তাজ্জব লীলা—ও চিৎকার করে উঠলো—ঐ তো সেই পামগাছ। কিন্তু একি? পথের ধারে সার দেওয়া বাকি গাছগুলো কই? বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না কেন? ওর দমবন্ধ হয়ে বুকটা জোরে টিপটিপ করছে।

এগিয়ে যেতে চোখে পড়ে পোড়ো জঙ্গলের মধ্যে হাড়গোড় বার করা জীর্ণ দেড়শো বছরের বাড়িটা মাথা তুলে জেগে আছে। রূপকথার গল্পে যেমন ডাইনির অভিশাপে সব মানুষ পাথর হয়ে গেলে জঙ্গল এসে রাজবাড়ি ঢেকে ফেলেছিল, অবিকল তেমনি। সারা গায়ে অশ্বত্থের বাহার আর নানান জংলা গাছ সাজিয়ে টুটিফাটা বাড়িটা যেন শুধু ওকে দেখবে বলেই এখনো ভেঙে পড়েনি।

অরুন্ধতীর মনে তারসানাই উচ্চগ্রামে বাজতে শুরু করে—চারিপাশের চেনা-অচেনা লোকজন ওর মন থেকে মুছে যায়, সব ঠিকঠাক আছে এমনিভাবে দালান পেরিয়ে ও ভিতরে ঢোকে। ভিতর মহলের উঠোনে কারা যেন চাল শুকোচ্ছে, ধান ভানছে, ঘুঘের গন্ধে ভরা হাওয়া। তারা মুড়ি ভাজছে—সুপুরী রোদে দিচ্ছে—কাঠের উনুনে রস জাল দিচ্ছে। গাছে ডাব পাড়তে উঠেছে, ও শাঁসওয়ালা ডাব ভালোবাসে তাই। ঘুমের ঘোরে ও এগিয়ে গিয়ে রান্নাবাড়ির সিঁড়িতে উঠতে চায়—ঢেঁকিঘরের দিকে তাকায়। —মুহূর্তে সব ফাঁকা। কোথায় গেল? ঢেঁকিঘর-রান্নাবাড়ির চিহ্ন নেই। ইতস্তত দু'চার ঘর মানুষ, যারা অস্থায়ী বাসা বেঁধেছিল উঠোনে, অবাক চোখে দেখে এই ঝকমকে চেহারার ভিনদেশী রমণীকে—কানাকানি করে—এসে পরিচয় চায়। বিস্মিত অরুন্ধতী বিরক্ত হয়ে তাকায়—যেন পরিচয় তো ওরই চাইবার কথা—এরা কারা? আহত অভিমানে ও চুপ করে থাকে। এখানেও ওকে পরিচয় দিয়ে ঢুকতে হবে নাকি? ওর যেন আশা ছিল গেলেই সকলে অভ্যর্থনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জানতে চাইবে, রায়কর্তার নাতিন এতদিন কোথায় ছিল? ও চলে যায় পিছনের জঙ্গলে গাছগাছালির মধ্যে শৈশব খুঁজতে। পুরনো সোঁদা আর বুনো জংলা গন্ধটা ঠিক রয়ে গেছে। চালতা গাছগুলো কই? বাতাবী

লেবু-ধরা গাছটা রয়ে গেছে—রান্নাঘরের পিছনে তেজপাতা গাছটাকেও পাওয়া গেল। নারকেল আর সুপুরীর জঙ্গল আরো ঘন আরো অন্ধকার, আগাছায় অপরিচ্ছন্ন। পিছন ফিরে পুকুরধারের বাঁধানো বেঞ্চিটার উপর বসবার জন্য সে এগোয়, যা তাকে অনেক শুনশান দুপুরে, মেঘলা বিকেলে আর গভীর রাতে নিশির মতো ডেকেছে। ছোটবেলায় যার উপরে বসে অনেক আবোল তাবোল ছড়া বলেছে—মাছেদের খেলা দেখেছে তন্ময় হয়ে। কোথায় কি? দিঘির মতো পুকুর মজে ডোবা—শ্যাওলা আর পদ্মপাতা বাকী জল ঢেকে দিয়েছে। পুকুরধারের ঝুমকো লতা আর লালপাতা বাদামগাছ উধাও। খুঁজে-পেতে বাঁধানো ঘাটের কয়েকটা সিঁড়ি জলের তলায় দেখা গেল শুধু।

ক্লান্ত হতাশ অরুন্ধতী শেষ আশ্রয় খুঁজতে চায় দোতলার ঘরখানায়। সেখানে আয়না দেওয়া পালঙ্কে বড়ো একটা মাটির কালো কানওয়ালা কুকুরকে জড়িয়ে কেবলই দু'ধারে মুখ দেখতো ও। তখন দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়ে গেছিল। ফলে বাবার বাঁধান শিশুসাথীর গল্পের মধ্যে হেসে-কেঁদে সারা হওয়া কত দুপুর-বিকেলের স্মৃতি; হ্যাঁ, নির্জন দুপুরে পায়রার বকবকম আর ঘুঘুর একটানা ডাকও যেন শোনা যেত তখন। আবার কখনও বন্ধ ঘরগুলোর দরজা খুলে পায়রার ঝটপটানি দেখা আর রহস্যময় আলো আঁধারির মধ্যে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ফেরার পথে চোখে পড়ে চণ্ডীমণ্ডপ নিশ্চিহ্ন, সেখানে আগাছার জঙ্গল। বৈঠকখানা ঘরটাকে যেন এখন কত ছোট মনে হয়, তার পাশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে উঠতে উঠতে ও ভাবে খাট পালং না থাক, বন্ধ ঘরে পায়রার বকবকম আর তাদের নোংরা ভ্যাপসা গন্ধমাখা আলোআঁধারিতেও ঢুকতে পারাটা অন্তত ওর পক্ষে এখন খুব জরুরী। পিছনের সম্মিলিত চিৎকার ওর কানে যায় না। ও সম্মোহিতের মতো ওঠে—প্রতীক্ষায় সমস্ত শিরা উপশিরা টানটান। কিন্তু একি? ঝনঝন করে একরাশ কাঁসার বাসন যেন ভেঙে পড়লো, মাথায় তুমুল আলোড়ন, জগতের বৃহত্তম হতাশা যেন অপেক্ষা করেছিল এখানেই! সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ওঠার মোড়ে পাঁচ-ছটা ধাপ যেন কোন ডাইনির যাদুকাঠিতে উধাও হয়ে গেছে, শুধু দেখা যাচ্ছে কালো গহ্বর। আবার দোতলার মুখের কাছে উৎকট ঠাট্টার মতো চার-পাঁচটি সিঁড়ি অক্ষত। অরুন্ধতীর বুকের মধ্যে ঢাকের বিসর্জনের বাজনা। এরা তাকে চিনতে পারেনি—তাদের কোল পাতাছিল সেই ছোট্ট সাত বছরের মেয়েটির জন্যেই শুধু? এই মধ্যবয়সী রমণীকে তারা চেনে না—তাই কি বাড়িটা তাকে ঢুকতে দিল না শেষ পর্যন্ত?

অনেক লোকজনের গলার স্বর কানে আসে—তারা ওকে টেনে বার করে—'বাড়ি ভেঙে পড়েছে, চলে আসেন চলে আসেন। এই ভাঙা বাড়ির মধ্যে কত কিছু আছে, কেউ ভিতরে ঢোকে? কোনমতে বেরোতে না বেরোতেই বাকি সিঁড়ির অংশ সমেত দোতলার ছাদ ভেঙে স্তূপের চেহারা নেয়। স্থবিরপ্রায় বিশাল একটা সাপ এঁকেবেঁকে পাশের জঙ্গলে ঢুকে যায়।

অরুন্ধতীর পেতে পেতেও স্বাদ-গন্ধ-বর্ণসমেত শৈশবকে ছুঁতে পারেনি। এখন তাকে আর নিশিতে ডাকে না। শুধু হঠাৎ কখনও স্বপ্নের মধ্যে হানা দেয় সেই ভাঙা অভিশপ্ত বাড়ি আর ব্ল্যাকহোলের মতো মধ্যপদলোপী সোপানশ্রেণী। তার পাশে নারকেল সুপুরির সারি পরম মমতায় মাথা নেড়ে কাছে ডাকে। তার বুকের মধ্যে কষ্ট হয়—ওটা এখন বিদেশ। দেশের নদীর পারে দাঁড়িয়ে ও বিদেশের কূল দেখে—নিঝুমরাতে ফিনিকফোটা জ্যোৎস্নায় পদ্মদিঘিতে এখনো কি পরীরা নামে? বুড়ো মাছেরা ঘাই মারে? আনমনা বর্ষার দিনে নদীর দিকে তাকায়—জলের তোড়ে ঘূর্ণি ওঠে—শুকনো গাঙে চল নামে, ও চেয়ে চেয়ে দেখে—গয়না নৌকো গিয়ে থামে বিদেশের ঐ খেয়াঘাটে।

শতবর্ষে নরেন্দ্র দেব

[সাহিত্য অকাদেমীর সৌজন্যে]

'ভারতী' পত্রিকা ও নরেন্দ্র দেব

অলোক রায়

নিতান্ত তরুণ বয়স থেকে নরেন্দ্র দেব সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর যথার্থ সাহিত্যজীবনের সূচনা ১৯১৫ সালে। এর আগে পর্যন্ত যা কিছু লিখেছেন তাকে প্রস্তুতি পর্বের রচনা বলতে পারি। অপরিণত অনুকারী সেই সব রচনার সঙ্গে নরেন্দ্র দেবের যৌবনে লেখার তুলনা করলে মনে হয়, খুব দ্রুত একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন তথা পরিণতি ঘটে গেছে, বিশেষত তাঁর কবিতায়। এখানে মনে রাখা দরকার, গদ্য পদ্য উভয়ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণ সত্ত্বেও মুখ্যত তিনি কবি। কবিতা রচনায় তিনি যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন সম্ভবত গদ্য রচনায় তা তিনি পান নি! অন্তত এই পর্বের নরেন্দ্র দেবের গদ্য রচনা[১] অনেক পরিমাণে ফরমায়েশী রচনা, সেখানে বিষয় বৈচিত্র্য আছে, বক্তব্যে চমকও আছে কখনও, কিন্তু কবিতায় যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখি, গদ্যে তা মেলে না।

'এই পর্ব' বলতে এখানে ভারতী-পর্বের কথা বলছি। 'ভারতী' পত্রিকায় নরেন্দ্র দেব যে খুব বেশি লিখেছেন তা নয়[২], তবু সাহিত্যের ইতিহাসে নরেন্দ্র দেবকে ভারতীর লেখক বলেই চিহ্নিত করা হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতিচারণে পাই—"ছেলেবেলায় যখন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত নবপর্যায়ের "ভারতী" হাতে পড়ে তখন শ্রীনরেন্দ্র দেবেরও নাম চোখে পড়ে। কিন্তু এতদিন পরে তাঁর তখনকার দিনের রচনা আমার মনে নেই।"[৩] নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "নরেন্দ্র দেব ভারতীযুগের সাহিত্যিক। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে আজ বাকি আছেন শুধু অমল হোম, আর প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, বাকি সবাই তিরোহিত। ভারতীর যুগ বাংলা সাহিত্যের এক স্বর্ণ যুগ, ভারতী যুগে যে আধুনিকতার উন্মেষ তারই বিকশিতরূপ কল্লোলযুগ। ভারতী দলের সাহিত্যিকদের সঙ্গে কল্লোলের কালের সাহিত্যিকদের যোগাযোগ ছিল। নরেনদার ধারাবাহিক

উপন্যাস 'যাদুঘর' কল্লোলে প্রকাশিত হয়। সেকালের মাপকাঠিতে সেই উপন্যাস ছিল দুঃসাহসিক।"[৪] 'ভারতীর যুগ' কথাটা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। 'ভারতী' পত্রিকা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৭৭ সালে 'ভারতী'র প্রথম প্রকাশ। তারপর বিভিন্ন সময় স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী ও রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৯৭৪ সালের পর স্বর্ণকুমারী দেবী পত্রিকা প্রকাশের কাজে আর সময় দিতে না পারার ফলে ঠাকুর বাড়ির জামাতা তরুণ লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) স্বর্ণকুমারীকে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন, মণিলালের আমলে তিনি হলেন যুগ্ম-সম্পাদক। মণিলাল-সৌরীন্দ্রমোহন যে ন' বছর 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৯১৫-২৩) সেই সময়টিকে 'ভারতীযুগ' বলা হয়ে থাকে। নরেন্দ্র দেব এই সময় 'ভারতী' পত্রিকায় শুধু নিয়মিত লেখেননি, তিনি 'ভারতী' পত্রিকা পরিচালনাতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই জন্য 'ভারতী'র সঙ্গে নরেন্দ্র দেবের সম্পর্ক সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১৯১৫ সালে মণিলাল-সৌরীন্দ্রমোহন-এর সম্পাদনায় নবপর্যায় 'ভারতী' (বৈশাখ ১৩২২) প্রকাশের আগেই জলধর সেনের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' (আষাঢ় ১৩২০) প্রকাশিত হয়েছে।

'ভারতী'র তুলনায় 'ভারতবর্ষ' নিতান্ত অর্বাচীন পত্রিকা হলেও অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে, এবং দীর্ঘদিন 'ভারতবর্ষে' নরেন্দ্র দেবের এত বেশি লেখা বেরিয়েছে যে তাঁকে 'ভারতবর্ষে'র লেখক বললেও অন্যায় হয় না। কিন্তু মণিলাল-সৌরীন্দ্রমোহনের 'ভারতী' স্বল্পজীবী হয়েও বিশিষ্ট চারিত্র লক্ষণের জন্য বাংলা সাহিত্যে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সেদিক থেকে 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে নরেন্দ্র দেবের যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ! আবার ভারতী যুগ বা ভারতীর লেখক বলতে এখানে শুধু বিশেষ একটি পত্রিকার কথা বলা হচ্ছে না, সে সময় তরুণ লেখকেরা এই সাহিত্যাদর্শের সন্ধানে আরও কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন মানসী, যমুনা, জাহ্নবী। সাহিত্যের ইতিহাসকার মণিলালের নায়কত্বে গঠিত 'ভারতীর বৈঠকের' বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন এইভাবে—"ভারতীর বৈঠক

কখনো সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে বা দলে পরিণত হয় নাই। এই বৈঠকে যাঁহারা সমবেত হইতেন তাঁহারা সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী। সুতরাং রবীন্দ্র-স্বীকৃতি ভারতীর বৈঠকের মূল সংঘনীতি বলিয়া ধরিতে পারি। অপর সংঘ-সূত্রগুলি খুব সুব্যক্ত না হইলেও সহজেই বোঝা যায়। সেগুলি হইল এই—(১) সাহিত্য সৃষ্টিতে গতানুগতিকতার বুলি পরিত্যাগ, (২) রচনারীতিকে সরল ও সবল করা, কথ্যভাষার কাছাকাছি আনা, (৩) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সাধারণ বাঙালি পাঠকের পরিচয় করানো, (৪) সমসাময়িক সমাজের গ্লানির প্রতি বিশেষ করিয়া পতিত নারীর প্রতি অবিচারের প্রতি গল্প-উপন্যাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, (৫) শিল্প-অনুরাগ এবং জীবনকর্মে শিল্পানুরাগের অভিব্যক্তি এবং (৬) মোগল চিত্রকলার অনুশীলনের আনুষঙ্গিক রূপে ফরাসী শব্দের প্রতি ঝোঁক"।[৫] বলা বাহুল্য, 'ভারতী'র লেখক যাঁদের বলা হয়, তাঁদের সকলের লেখার মধ্যেই এই সবগুলি লক্ষণ হয়তো মিলবে না, তবে সাধারণভাবে বলা যায়, বয়সে তরুণ এই লেখকেরা কমবেশি পরিমাণে প্রাচীন সাহিত্যিক ও সামাজিক বিধি-বিধান ভাঙতে সচেষ্ট ছিলেন। আবার 'ভারতী' পত্রিকায় যাঁদের লেখা প্রকাশিত হতো তাঁরা সকলেই সমবয়স্ক ছিলেন না। এই সময় 'ভারতী'তে যাঁদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। বয়সে প্রবীণ আগের যুগের লেখক, যেমন—দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রসন্নময়ী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি। নিতান্ত অল্পবয়সী লেখক যাঁদের আমরা 'কল্লোলে'র লেখক বলে জানি, যেমন—নজরুল ইসলাম, অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি। আর বিশেষ-ভাবে 'ভারতী'র লেখক যাঁদের জন্ম ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে, যেমন—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, গিরিজাকুমার বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি। কবিতা লিখতেন না, অথচ ভারতী বৈঠক বা মণিলালের আসরে যোগ দিতেন আরও কয়েকজন, যেমন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়। পত্রিকার কার্যালয় ছিল ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে (এখনকার কৈলাস বসু স্ট্রীটে) কান্তিক প্রেসের তিন তলায়। এখানেই বসতো 'মণিলালের আসর'।[৬]

নরেন্দ্র দেব তখন থাকতেন ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে পৈতৃক গৃহে। অমল হোম, সুধীর সরকার, চারু রায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী থাকতেন কাছে-পিঠে। একমাত্র হেমেন্দ্রকুমার রায় আসতেন পাথুরিয়াঘাটা থেকে। এই কজনের মধ্যে ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। হেমেন্দ্রকুমার দাবি করেছেন, তিনিই নরেন্দ্রকে ভারতীর দলভুক্ত হতে আহ্বান করেন। "আমাদের বৈঠকে এসেই তিনি একেবারে জমে গেলেন, হয়ে পড়লেন নিয়মিত সভ্য। অপূর্ব ছিল আমাদের সেই সাহিত্য-সভা। কাব্য, সংগীত ও শিল্প নিয়ে সর্বদাই সেখানে চলত কলগুঞ্জন। আজ যাঁরা সাহিত্যে ও শিল্পে অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই সেই কাব্য যুগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন মধুলোভী ভ্রমরের মতো।··· ঐ সাহিত্যসভা থেকে আমরা সকলেই লাভ করেছি কত প্রেরণা এবং রচনার নব নব উপাদান। ওখান থেকে কয়েক বৎসরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা ও কবিতা ভূরিপরিমাণেই। ওখানে গিয়ে নিয়মিত আসন গ্রহণ করলে লেখকদের রচনাশক্তি প্রবুদ্ধ হয়ে উঠত অধিকতর। নরেনের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। বেড়ে উঠল তাঁর লেখনীর প্রজননশক্তি। তিনি লিখতে লাগলেন, রাশি রাশি কবিতা। অন্য শ্রেণীর রচনাতেও করলেন হস্তক্ষেপ।"[৭]

'ভারতী' পত্রিকায় নরেন্দ্র দেবের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে—'পূর্ব গগনের প্রথম প্রভাত'। এই সময় তিনি যে সব কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব স্পষ্ট। 'ভারতী'র কবিদের সকলের লেখাতেই রবীন্দ্রানুসরণ ঘটেছে। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের যৌবন বন্দনা 'ভারতী'র কবিদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যৌবনের যে ভাবগম্ভীর রূপ ধরা পড়েছে, তরুণ বয়সী কবিদের রচনায় তার সন্ধান করে লাভ নেই। পঞ্চাশোর্ধ রবীন্দ্রনাথ ভুলে যাওয়া যৌবনের কাছ থেকে পত্র পান—'লিখেছে সে—আছি আমি অনন্তের দেশে / যৌবন তোমার / চিরদিনকার'। 'ভারতী'র কবি সেখানে লেখেন—'পৃষ্ঠ বলে চাই দুনিয়া / আমরা মানুষ তরুণ মানুষ / —কল্প-লোকের গগনে পরে উড়িয়ে দেব অরুণ ফাল্গুন'।[৮] তবে এই সব কবিতার মধ্যেই নজরুল ইসলামের আগমনী শোনা গেছে। প্রেমের কবিতা রচনাতেও রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' 'মহুয়া' তরুণ কবিদের মনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে—'ফাল্গুনের হে নব ফাল্গুনী—/ আজও তাই শুনি / প্রসূন-গাণ্ডীবে তব মুহুর্মুহু কোদণ্ড টঙ্কার / সম্ভোগের সংগীত ঝংকার / দিগন্ত ছাপিয়া উঠে যবে / মদনের আনন্দ

উৎসব।'[৯] কিন্তু সেখানেও সাধারণভাবে প্রথানুসরণ রবীন্দ্রানুসরণের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, যেমন—'কোন্ শরতের সোনার প্রাতে আমার বাঁশি বেজে, সখী তোমার ভুলিয়েছিল প্রাণ / যমুনা জল আনতে এসে আমায় ভালবেসে, দিয়েছ রাই, ভাসিয়ে কুলমান'।[১০]

তবে সেই সঙ্গে স্মরণীয়, নরেন্দ্র দেব বাংলা প্রেমের কবিতার ঐতিহ্যের যেমন ধারাবাহী, তেমনি ভারতীযুগের কবি হিসাবে কল্লোলীয় প্রেমের কবিতার তিনি পূর্বসূরীও বটে। রবীন্দ্রনাথের পূরবী-মহুয়া পর্বের কবিতায় প্রেমের বিরহমূর্তি তথা ভাবরূপই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'ভারতী'র তরুণ কবিরা প্রাচীনের ভ্রূকুটির সম্মুখীন হয়েও প্রেমের কবিতায় সেকালে আপত্তিকর ইন্দ্রিয়চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়বে 'ভারতী'র লেখকদের বিরুদ্ধে সেকালে এই ধরনের অনেকগুলি অভিযোগ পদ্যাকারে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে—

যা লিখিব তাই হইবে পদ্য
ছত্র ছাড়িলে গদ্য
তর্জমা করি হইবি মোপাসাঁ
চুরিটি করিয়া মন্দ।
রাজ দরবারে লভিবি তখমা
পাবি প্রশংসাপত্র
দলে এলে রোজ খাবি দুধভাতি
সন্দে নাহি তত্র।
নাটক লিখিবি আটক করে কে ?
রচিবি যা, তাই গল্প !
টপ্পা গাহিবি, হবে ব্রহ্ম-বেদ-
টোল সে বধূর তল্প।
আদি রসে ভক্তি উদ্বলি উঠিবে—
ডুবিবে কল্প কল্প।
এ-ওর ভক্ত সমাজে তোদের
করিয়া লইব ভর্তি—
কাজ ফতে করে তাড়াব না আর,
কামের শপথ—সত্যি।[১১]

বিদেশী গল্প-কবিতার চুরি বা দুর্বোধ্যতার অভিযোগ প্রায় সব সময়ই তরুণ লেখকদের লেখার বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে। আদিরসের আতিশয্যও প্রায়ই আপত্তিকর বিবেচিত হয়। মনে পড়বে একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও এই ধরনের অভিযোগ করা হতো। 'ভারতী'র লেখকেরা আবার দীর্ঘদিন পরে সেই সব অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। অনুবাদকর্মে তাঁদের আগ্রহ ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁদের রচনা কখনও দুর্বোধ্য ঠেকতো। তাও বোঝা যায়। কিন্তু অশ্লীলতার অভিযোগ উঠলো বিশেষ কয়েকজন লেখকের বিরুদ্ধে। যাঁদের মধ্যে অন্যতম নরেন্দ্র দেব। বলা বাহুল্য আজকের দিনে 'বসুধারা' কাব্য পড়লে আমাদের কাছে অনেক কবিতাই তরুণ কবির উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, কিন্তু সেদিন এই সব কবিতাই প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—

১. সহকারে অঙ্গ বেড়ি নিলাজ হয়ে কণ্ঠলগ্নলতা—
কইছে কথা কানে কানে দিবা নিশি প্রাণের গোপন কথা।[১২]

২. যুগে যুগে নব-নিধু-বনে
খুঁজিতে যে আসে,
সকল ভুলিয়া ভালবাসে—
তারে কি দেবে না প্রতিদান?[১৩]

৩. বলবে না কি বক্ষে তুলে
কল্যাণ-কর বুলিয়ে চুলে
ব্যাকুল অধর চুমি—
ধন্য হলেম তোমার প্রেমের আজকে প্রিয়তমা, ধন্য আমার তুমি।[১৪]

৪. তোমাকে চাহিয়াছিনু বাঁধিয়া রাখিতে
বন্দী করি এ বাহু বন্ধনে
চপল-অঞ্চলা[১৫]—

৫. তব চুম্বন-প্রেম-চন্দনে
রক্তিত দুটি আঁখি,
ললাটে চিবুকে কপোলে কণ্ঠে
ধন্য হয়েছি মাখি!
ওগো, এ মিলন-মহামুহূর্তে
দেহ মনে শুধু চাই,

তোমাতে আমাতে বুকে মুখে যেন
নিঃশেষ হয়ে যাই![১৬]

শেষ কবিতাটি 'ভারতী' (কার্তিক ১৩৩০) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা-ছন্দ রাবীন্দ্রিক হলেও এ কবিতা করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, এমনকি সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও লেখা সম্ভব ছিল না, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শুধু কবিতাতে নয়, 'ভারতী'তে প্রকাশিত গল্পেও তরুণ লেখকের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে। 'ভারতী'তে প্রকাশিত নরেন্দ্র দেবের একটি গল্পের "যাহাদের দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে"। হয়তো কাহিনীবস্তুতে খুব অভিনবত্ব নেই, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটুকু লক্ষণীয়। আর এরই ফলে নরেন্দ্র দেবের পক্ষে 'ভারতী' 'ভারতবর্ষে'র লেখক হওয়া সত্ত্বেও 'কল্লোল-কালিকলমের' সঙ্গে একাত্মবোধ সম্ভব হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কল-ভাষণে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও কল্লোলের সঙ্গে নরেন্দ্র দেবের যোগাযোগের কাহিনী তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—"সবচেয়ে নিকট ছিলেন নরেনদা। প্রায় জলধর দাদারই দোসর, তাঁরই মতো সর্বতোভদ্র, তারই মতো নিঃশত্রু। আর আররা কল্লোল আপিসে কদাচিৎ আসবেন, কিন্তু নরেনদাকে অমনি কালে-ভদ্রের ঘরে ফেলা যায় না।··· নরেনদার পরিহাস-প্রসন্ন যে পরিহাস সর্ব অবস্থায়ই মাধুর্যমার্জিত। 'কল্লোলে' প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস-এ তিনি এক চমকপ্রদ উক্তি করেন। ঠিক তিনি করেন না, তাঁর নায়ককে দিয়ে করান। কথাটা আসলে নির্দোষ নিরীহ, কিন্তু সমালোচকরা চমকে ওঠে বলেই চমকপ্রদ। "Cousins are always the best targets. সমাজতত্ত্বের একটা মোটা কথা, যার বলে বর্তমানে হিন্দু বিবাহ-আইন পর্যন্ত সংশোধিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেকালে ঐ সরল কথাটাই সমালোচকের বিচারে অশ্লীল ছিল। যা কিছু চলতি মতের পন্থী নয় তাই অশ্লীল।"[১৭] আসলে 'ভারতী' থেকে 'কল্লোল' এমন কিছু দূরের পথ ছিল না। কিন্তু তবু তো ভারতীযুগের বেশিরভাগ লেখক ভারতী-পরবর্তী যুগে আর অগ্রসর হতে পারেননি—একই বৃত্তে আবর্তিত হয়েছেন। নরেন্দ্র দেব তাঁদের মধ্যে অনেকের থেকে দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে নয়, মানসিক ঔদার্য আর সেই সঙ্গে নতুন কালের সৃষ্টিধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই প্রায় সত্তর বছরের বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হননি। 'ভারতী'র খুব কম লেখক সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়। নরেন্দ্র দেব খুব বড়ো লেখক না হতে পারেন—কিন্তু তাঁর বিচিত্রমুখী সাহিত্য-প্রতিভার যথার্থ বিচার

হয়নি! জন্মশতবর্ষ পালনকালে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হবে তাই নয়—আমরাও বোধ হয় লাভবান হব।

উল্লেখপঞ্জি

১. 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত নরেন্দ্র দেবের প্রবন্ধ—মনের বয়স (কার্তিক ১৩২৭), মুখ দর্পণ (কার্তিক ১৩২৭), মার্কিন বৈজ্ঞানিক মাইকেলসন (বৈশাখ ১৩২৭), আদি ধাতুর জন্ম-কর্ম (বৈশাখ ১৩২৭), বিনি তারের সুর (আষাঢ় ১৩২৯), চার হাজার বৎসর পূর্বে (আশ্বিন ১৩২৯), মতিমহল (অগ্রহায়ণ ১৩২৯), লর্ড ক্লিক (বৈশাখ ১৩২৭), লেখাপড়া জানা কুকুর (আষাঢ় ১৩২৭)।

২. 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত নরেন্দ্র দেবের অন্যান্য রচনা—কবিতা: পূর্ব গগনের প্রথম প্রভাত (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭), সত্যেন্দ্র প্রয়াণ (শ্রাবণ ১৩২৯), নট-মঙ্গল (পৌষ ১৩২৯), বরণ (চৈত্র ১৩২৯), কনকাঞ্জলি (কার্তিক ১৩৩০), শারদীয়া (আশ্বিন ১৩৩১), অপরিচিতা (বৈশাখ ১৩৩৩)। গল্প: ফকিরদা (বৈশাখ ১৩২৮), বুক ভাঙ্গা (আষাঢ় ১৩৩৫), যাহাদের দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে (আশ্বিন ১৩৩৩)। উপন্যাস: বারোয়ারি উপন্যাস (আষাঢ় ১৩২৭)।

৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'নরেন্দ্রনামা', কথাসাহিত্য, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃ. ১১৭২।

৪. ভবানী মুখোপাধ্যায়, 'অনন্ত-নবীন নরেন্দ্র দেব' কবি নরেন্দ্র দেব স্মরণিকা, সাহিত্যতীর্থ, ১৩৮০, পৃ. ৪৩।

৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৭৮, পৃ. ১৭১।

৬. দ্র. হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'মণিলালের আসর', মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

৭. হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'এখন যাঁদের দেখছি', ১৩৬২, পৃ. ১৭৪-৭৫।

৮. হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'পথ পাগলের গান', ভারতী, আশ্বিন ১৩২৯।

৯. নরেন্দ্র দেব, 'কাল্পনী', বসুধারা (১৯২৮), পৃ. ৮৫।

১০. নরেন্দ্র দেব, 'চিরন্তনী', বসুধারা, পৃ. ৬৫।

১১. দ্র. অলোক রায়, 'যতীন্দ্রমোহন: কবি ও কাব্য', ১৩৭১, পৃ. ৫৫।

১২. নরেন্দ্র দেব, 'ব্যর্থ বরষণ', বসুধারা, পৃ. ১১।

১৩. তদেব, 'সন্তপ্ত শরৎ', পৃ. ২১।

১৪. তদেব, 'বিফল বসন্ত', পৃ. ২৯।

১৫. তদেব, 'ক্ষণিকের অতিথি', পৃ. ৫৪।

১৬. তদেব, 'কনকাঞ্জলি', পৃ. ৫৯।

১৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', ১৩৬৬, পৃ. ১৫২।

মানুষ গড়ার পাঠশালা ও নরেন্দ্র দেব

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

'আমাদের এই পাঠশালাতে / পড়বে কেবল ছুটির পড়া / পাঠশালার এই আটচালাতে চলবে দেশের মানুষ গড়া' : এই চারটি ছত্র মুদ্রিত থাকতো নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত 'পাঠশালা' পত্রিকার প্রচ্ছদে। মেকলে সাহেবের কল্যাণে, উপনিবেশিক ভারতবর্ষে 'পড়া' এবং ছুটির মধ্যে যে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না, শিশুর জগৎ যে দুটি পরস্পরবিরোধী ক্ষেত্রে বিভাজিত হয়ে গিয়েছিল, সে-কথা বোঝাবার জন্য আজ আর কোনো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল, উপনিবেশিক প্রশাসনের খাতিরে কিছু দাক্ষিণ্যভোগী, পরঅনুগ্রহনির্ভর মানুষ তৈরি করা ; তবে কোনো মানুষ বানাবার বিভিন্ন কারখানা থেকে সব সময়ে যে মনোমতো ছাঁচ-এ ঢালাই করে নেওয়া মানুষ বেরোতো না, কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও বেথাপ এবং বেমানান থেকেই যেতেন, সে আর এক কাহিনী। সেই সব বিরল ব্যক্তিত্বদের ভুলে না গিয়েও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় হয়েও, রুচিসম্পন্ন ও মতামতে সাহেব হবার যে দুর্মর দূরাকাঙ্ক্ষা বাঙালি ভদ্রলোকদের একাংশকে পেয়ে বসেছিল তার ইন্ধন জুগিয়েছিল ঐ শিক্ষাব্যবস্থা। চরিত্রের দিক থেকে ঐ শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল বিজ্ঞানবাদী (সায়েন্টিস্টিক) ও বিষয়মুখী (অবজেকটিভিস্ট), শিশুকে আদৌ বিষয়ীর (সাবজেক্ট) মর্যাদা দেওয়া হয়নি সেখানে, কোনো হিসেবের মধ্যে আনা হয়নি আর নিজস্বতা ও অফুরান সম্ভাবনার প্রসঙ্গটিকে, এক প্রাকনির্ধারিত বিষয়রূপের (অবজেক্ট) সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই ছিল না তা। স্বভাবতই সেই সীমার মধ্যে কোনো প্রসারতা ছিল না, ছিল না জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্বন্ধ : ফলে 'গড়া' হয়ে উঠেছিল স্বাস্থ্যবিধির এক রকমফের মাত্র, তিক্তস্বাদ হলেও উপযুক্ত চাকুরিজীবী হয়ে ওঠাবার জন্য দরকারি এক পাঁচনের শামিল। বহুদিন আগে ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছিলেন :

['আমাদের ছাত্রদিগের] গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু।' আর সেই গ্রন্থজগতের নমুনাই বা কীরকম? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'পৃথিবীর পুস্তকসাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না।' জাতীয়তাবাদী অধ্যায়ে বহু সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী চিন্তাবিদদের কাছে এ-কথা খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে দেশের আর্থিক দুর্দশা ও আত্মিক পতন দুইই সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দুই-এর মধ্যে একটি আবশ্যিক যোগ আছে। তাঁরা জানতেন, বিদেশী শক্তির সঙ্গে লড়াই-এর রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক মাত্রার পাশাপাশি একটি মতাদর্শগত মাত্রাও আছে : পরঅধিকৃত দেশের পাশাপাশি পরকবলিত চৈতন্যের উদ্ধারের কাজও সমান জরুরি ; তাঁদের অনেকেই এ-ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, বিদেশী বোলচাল, ধরনধারণ যদি দেশের লোকের হাড়ে-মজ্জায় মিশে থাকে, বিদেশী স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের ওতপ্রোত সংশ্লিষ্ট করে না নিলে, নিজেদের কাছেই যদি তারা অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, তা হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও বিশেষ লাভ হবে না ; সর্বগ্রাসী যে বিদেশী ভাষা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে, সর্বস্তরে গ্রন্থিমোচন সম্ভব করে তুলতে না পারলে মুক্তি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত থেকে যেতে বাধ্য। নরেন্দ্র দেব 'মানুষ গড়া'র যে ব্রত নিয়েছিলেন তার তাৎপর্য বুঝতে ঐ জাতীয়তাবাদী পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত জরুরি। পাঠশালার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, (আশ্বিন ১৩৪৪) সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছিল : 'শিক্ষামূলক কাগজ ছেলে-মেয়েরা পছন্দ নাও করতে পারে এরকম কথা হিতৈষী বন্ধুরা অনেকেই আমাদের বলেছেন। কিন্তু তাঁদের আশঙ্কা সম্ভবত ঠিক নয়, কারণ আমরা দেখতে পাই সকল বিষয়েই জানবার ও শেখবার জন্য ছেলেমেয়েদের আগ্রহ এবং কৌতূহলের অন্ত নেই। তাদের প্রতিদিনের প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় অভিভাবক ও শিক্ষকগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ছেলেমেয়েদের সেই নানা বিচিত্র জিজ্ঞাসার অনেক উত্তরই তারা পাঠশালায় পাবে। সুতরাং এ পত্রিকা তাদের ভাল লাগাই সম্ভব।' এই সম্পাদকীয়টি যতটা-না শিশুদের তার চেয়ে অনেক বেশি তাদের অভিভাবক-দের উদ্দেশে লিখিত। নিছকই ছেলেভুলোনো, নেহাতই শিশুদের, সহজপাঠ্য লেখার পরিবেশন যে পাঠশালার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নয় সেকথা খোলাখুলি

জানিয়ে দিয়েছিলেন সম্পাদক। সেইসঙ্গে পত্রিকাটি যে সবরকম সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত থাকবে তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি : 'শিশুরা নির্মলচিত্ত। তারা সাম্প্রদায়িকতার ধার ধারে না। তাদের মধ্যে জাতিধর্মের ভেদবুদ্ধি নেই। পাঠশালাও সাম্প্রদায়িক কাজ নয় : হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই চিন্তাশীল লেখকগণের সুলিখিত রচনা এ-পত্রিকায় সমাদরে প্রকাশিত হবে।··· হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেমানুষদের মানুষ করে গড়ে তোলবার সদুদ্দেশ্য নিয়ে পাঠশালা পরিচালিত হবে।' বাংলায় তখন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠছে, নানা দুরভিসন্ধির ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এক চরম বিন্দুতে পৌঁছতে চলেছে, সেই অব্যবহিত প্রসঙ্গটিকে বাদ দিলে এই মন্তব্যটি আমাদের কাছে কোনো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আনবে না। কেবল সাম্প্রদায়িকতা নয়, সব রকম কূপমণ্ডূকতা বা বদ্ধ আচারানুবর্তিতাই যে শিশুদের মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায়, সে-ব্যাপারে সজাগ ছিলেন নরেন্দ্র দেব। তাঁর আদর্শ ভবিষ্যৎ 'মানুষে'র ধারণাটি ঠিক কী ছিল তার একটি আন্দাজ পাওয়া যায় 'পাঠশালা'র বিভিন্ন বিভাগ-পরিকল্পনা থেকে। প্রথম সংখ্যায় বিভাগগুলো ছিল এই রকম : 'কবিতা', 'গল্প', 'উপন্যাস', 'অনুবাদ', 'নাটক', 'জীবনী', 'ইতিহাস', 'বিজ্ঞান', 'মায়ের কথা', 'ভূ-পরিচয়', 'খেলাধূলা', 'ধাঁধা', 'বিশ্ববার্তা', 'আবিষ্কার', ক্রমে ক্রমে 'নানাপ্রসঙ্গ', 'শিক্ষার কথা', 'বিচিত্র সংবাদ', 'গত মাসের খবর', 'চিঠিপত্র' সংযোজিত হয়েছে, পরে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, গণিত, অর্থনীতি, মনের বৈচিত্র্য, প্রশ্নমালা, বিবিধ প্রবন্ধ, সংগীত ও স্বরলিপি, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, জাদুবিদ্যা, শিল্পকলা, (চারুকলা এবং কারিগরী বিদ্যা), হাস্যকৌতুক, পৌরাণিকী বিষয়গুলি এসেছে। একেবারে গোড়ার দিকেই বিবিধ প্রবন্ধ শিরোনামায় দেওয়া হচ্ছে, বিশ্বসাহিত্যের স্বল্প পরিচয়, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস। একই সংখ্যায় 'শিল্পকলা' বিভাগে পাশাপাশি থাকছে বেঙ্গল ঘরানার ছবি, জাপানি জলরং এবং রেনেসাঁস ইতালির তৈলচিত্রের নমুনা : তুলনামূলক আলোচনার সূত্রে তিনটি ধারার বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে তোলা হচ্ছে। যদিও 'মায়ের কথা' বিভাগে রন্ধনবিজ্ঞান এবং ছাঁচকাট ও সেলাই স্থান পেয়েছে, এ কাজগুলোকে কেবল মেয়েদের কাজ হিসেবে অবজ্ঞা করবার যে কোনো যুক্তি নেই সে সম্পর্কে প্রথম বাক্যেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে : 'ছেলে-মেয়ে উভয়েরই রন্ধনবিজ্ঞান শিক্ষা করা উচিত।' মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্বের মতো গুরুভার বিষয়ও বাদ যায়নি। নরেন্দ্র

দেবই বাংলায় ইংরেজি ক্রসওয়ার্ডের ধাঁচে শব্দসন্ধানের প্রচলন করেন। 'পাঠশালা'র লেখক-তালিকাও তার বিভাগ পরিকল্পনার মতোই বিস্ময়কর : সেখানে প্রতিষ্ঠিত নামীদামী লেখকরা যেমন আছেন তেমনি পাশাপাশি উদীয়মান বহু সাহিত্যিকদের নামও পাওয়া যায় : পরে তাঁদের অনেকেই বাংলা শিশুসাহিত্যে অগ্রণী লেখক হিসাবে গণ্য হয়েছেন। পাঠশালায় লিখেছেন : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, কালিদাস রায়, দিলীপকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, হুমায়ুন কবীর, সুনির্মল বসু, বুদ্ধদেব বসু, বন্দে আলি মিঞা, গিরিজাকুমার বসু, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখলতা রাও, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, রাধারানী দেবী এবং আরো অনেকে। 'পাঠশালা'র পাতায় যেমন-তেমন করে বিভিন্ন মালমশলা জোগাড় করে আনা হয়নি, তার বিন্যাস পরিবেশনের পেছনে যথেষ্ট প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পাঠকদের নিছক পল্লবগ্রাহী করে তোলা পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যাতে তারা উৎসাহী হতে পারে, সমস্ত ধরনের ক্ষুদ্রতা-সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে যাতে তারা বহুপ্রসারী মনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সে দিকে লক্ষ্য ছিল সম্পাদকের। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও একটি সংগত প্রশ্ন অবশ্য তোলাই যেতে পারে : এত বর্ণাঢ্য আয়োজন সত্ত্বেও পাঠশালায় এবং নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যে শিশুকে কি বিষয়ী হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল, তাকে কি সত্যিই নিয়ে আসা হয়েছিল দৃষ্টির কেন্দ্রমূলে, না কি এখানেও সে বিষয় মাত্র, বড়দের— তা তাঁরা যতই শিশুদরদী হোন-না কেন, এক মনগড়া, নিষ্ক্রিয় নির্মিতি কেবল, সত্যকার অংশীদার নয়? তাছাড়া আদর্শ ভবিষ্যৎ মানুষের যে বিমূর্ত ধারণাটি নরেন্দ্র দেবের শিশুসাহিত্যের পেছনে সবসময়ে সক্রিয় হয়ে থেকেছে, তাই কি স্ববিরোধ-মুক্ত ছিল, অন্যান্য জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদদের মতো তাঁর লেখাতেও কি মতাদর্শগত বদ্ধতার প্রমাণ নেই, শেষ বিচারে তাঁর সাহিত্যও কি নানা অসংগতিতে পরিকীর্ণ এবং বহুখণ্ডিত নয়? এই প্রবন্ধে আমরা খতিয়ে দেখতে চাই নরেন্দ্র দেব হিতবাদের সঙ্গে গল্পের সন্ধি স্থাপন করতে গিয়ে হিতৈষণাকেই প্রধান করে তুলেছিলেন কিনা, আর তার ফলে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে রচিত হয়েছে কিনা এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান।

'পাঠশালা'র প্রথম কয়েক সংখ্যার 'জীবনী' বিভাগে আলোচিত হয়েছে,

জগদীশচন্দ্র বসু, রামকৃষ্ণদেব, শরৎচন্দ্র, চৈতন্যদেব, সক্রেটিস ও হিটলারের জীবনী। ১৩৪৫ সালে হিটলার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল হিটলার-প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ, হিটলার যে জার্মানির মুক্তিদাতা, তাঁর অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ যে নিছক রটনা মাত্র, শত্রুপক্ষের অপপ্রচার কেবল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই লেখকের। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই স্বরান্তর লক্ষ করা যায় ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী -লিখিত 'ইহুদীরা — হিটলারের দেশে' প্রবন্ধে; হিটলারের ইহুদী-নিপীড়ন যে মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় সে কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝান লেখক। ১৩৪৭-এর আগে নানাপ্রসঙ্গ বিভাগে ব্রিটিশ-বিরোধী তির্যক মন্তব্য পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানি ও জাপানই হয়ে ওঠে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। মিত্র-জোটের অন্যতম শরিক ব্রিটেনের সৈনিকরা যে এগিয়ে চলেছে, সে কথা সগৌরবে জানান লেখক। অস্বাক্ষরিত লেখামাত্রই যে স্বয়ং সম্পাদকের আমরা তা স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি : নানা প্রসঙ্গ, বিশ্ববার্তা, শিক্ষার কথা, বিবিধ সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি বিভাগের অন্তর্গত সে-সব। নানা প্রসঙ্গ এবং বিশ্ববার্তায় চীনের প্রতি এক স্পষ্ট পক্ষপাতের প্রমাণ বরাবর পাওয়া যাবে। কেবল পাঠশালার পাতায় নয়, নরেন্দ্র দেবের গল্পেও আছে ঐ একই মানসিকতার ছাপ। 'রকমারি গল্প' বই-এর অন্তর্গত চীন-বিপ্লবের পরে লেখা 'তে-বাঘা সর্দার' গল্পে তিনি অনায়াসে জানাতে পারেন : 'চীনদেশের গল্প এটা। গ্রামের একদল ছেলে শিকারে বেরিয়েছিল। তাদের বয়স অল্প হলেও তারা এটা বুঝেছিল যে গ্রামের শত্রু হল দুটি। একটি গাঁয়ের ধনী মহাজনেরা, আর একটি হল হিংস্র বন্য পশুরা। ধনী মহাজনদের নিঃশেষ করবার ভার নতুন চীনের লোক-সরকার নিজের হাতে নিয়েছেন।' নরেন্দ্র দেব -সম্পাদিত পাঠশালায় সমসাময়িক রাজনীতির প্রসঙ্গ অবাধে চলে এসেছে, রাজনীতি ব্যাপারটা বড়দের একচেটিয়া ব্যাপার, ছোটদের পক্ষে বড়ই গুরুপাক তা, রাজনীতির প্রকোপে ছোটদের তথাকথিত সুকুমার চিত্তবৃত্তি স্ফুরণে বাধা পাবে, এমন কোনো ছুঁৎমার্গিতার সংস্কার ছিল না তাঁর। তাই সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ কখনোই আপাত নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে, সাদামাটা খবর হিসেবে পাঠশালায় পরিবেশিত হয়নি, সচেতনভাবে এক নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে, কোনো বিশেষ পক্ষ বেছে নিয়েই সে-সব লেখা হয়েছে, নমুনাস্বরূপ ভাদ্র ১৩৪৬ সংখ্যার নানা প্রসঙ্গে রাজবন্দীদের মুক্তি-দাবি সম্বন্ধে কী লেখা হয়েছিল দেখা যাক : কিন্তু কংগ্রেসের তো স্বাধীনভাবে কিছু করবার শক্তি নেই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে বহু প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ

আছেন বটে কিন্তু তাঁরা সকলেই চিরনাবালকত্ব ব্রত গ্রহণ করে মহাত্মা গান্ধীর চরণে দাসখত লিখে দিয়েছেন। কাজেই এ বিষয়ে প্রভুর কি আদেশ জানবার জন্যে তাঁরা মহাত্মার কাছে নিবেদন জানালেন। প্রভুর শ্রীমুখের বাণী এলো—রাজবন্দীদের অনশন ত্যাগ করতে বলো।' একটু পরেই বলা হয়েছে : 'সুভাষচন্দ্র ফিরে এসে রাজবন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।' গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্রের প্রতি স্বরভঙ্গির তারতম্য খুব পরিষ্কার ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে লেখক কোন্ দিকে দাঁড়িয়ে। কোনো রাখঢাক নেই সে-ব্যাপারে। নরেন্দ্র দেবের সামাজিক গল্প-উপন্যাসেও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে সরাসরি রাজনৈতিক মন্তব্য; সে-সব আদৌ প্রক্ষিপ্ত নয়, গল্পের কাঠামোর সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পর্কযুক্ত। বস্তুত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে গেলে তাঁর লেখার তাৎপর্য-সন্ধান অসম্ভব হয়ে পড়বে। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে নরেন্দ্র দেব -লিখিত বিভিন্ন রূপকথার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। কেননা তাঁর রূপকথার সঙ্গে সামাজিক গল্প-উপন্যাসের কাঠামো এবং মতাদর্শ, এই দুই দিক থেকেই যোগ আছে। মূলত একই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে দুই আলাদা ক্ষেত্রে।

নরেন্দ্র দেবের বেশির ভাগ রূপকথার গল্পে দেখি, নায়ক গল্পের গোড়ায় যতই কুশ্রী কুরূপ হোক, বা কন্যা যতই অভাগা, শেষ পর্যন্ত জানা যায় নায়ক হয় ছদ্মবেশী, নয় শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র আর কন্যা ভাগ্যের ফেরেই অমন বিপাকে পড়েছে, আসলে সে ধনী সদ্‌বংশজাতা। আখ্যানগুলোর পেছনে সমাজসংহতির এক বিশেষ ধারণা চূড়ান্ত নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে : অভিজাত না হলে সে-সম্প্রদায়ে ভুক্ত হবার ছাড়পত্র কখনোই মিলতে পারে না, উচ্চবর্ণদের সেই নির্ভেজাল স্বসম্পূর্ণ পরিসরে বিসদৃশ, বেমানানদের কোনো স্থান নেই। আর তাই গল্পের শেষে নায়ক-নায়িকার অবস্থার দৈব উৎক্রম ঘটানো অত অনিবার্য হয়ে ওঠে; গোড়ার দিকে নায়ক বা নায়িকাকে যে-সব ভেদচিহ্ন অভিজাতমণ্ডলী থেকে পৃথক করে রাখে, তা বেমালুম নিশ্চিহ্ন করে দিতে না পারলে আখ্যান ইতিবাচক, সুস্থিত পরিণতিতে পৌঁছতে পারে না। যেমন, 'সোনার ময়ূর' গল্পের শেষে গরিবের ছেলে কুশ্রী গোবর্ধনের হাতে মেয়েকে তুলে না দিলে কথার খেলাপ হবে জেনেও রাজার মনে হয় 'বানরের গলায় মুক্তোর মালা দিতে হবে? এও কি হয়?' কিন্তু সোনার ময়ূর এই সময় ডেকে উঠে রাজকুমারীর কোল থেকে উড়ে এসে গোবর্ধনের কাঁধে এসে বসলো, আর দেখতে দেখতে গোবর্ধনের চেহারা রাজপুত্রের মতো সুন্দর

হয়ে উঠলো। পরম সুপুরুষ যেন!' একই ধরনের ঘটনা ঘটে 'যুবরাজ', 'রাখাল-রাজা', 'ইন্দ্রজিৎ' গল্পে। ব্যতিক্রম হিসেবে কোনো কোনো আখ্যানে যেমন 'বীণার বরাত' বা 'কেশবতী কন্যা'র নায়িকা অভিজাতবংশের মেয়ে হয় না, কিন্তু তা হলে কী হবে, তাদের সবাই সুভদ্র, মানিত, বাধ্য এবং অনুগত : এক স্বভাবসুলভ সহনশীলতা ও আভিজাত্যম্মন্যতা তাদের বর্মের মতো ঘিরে থাকে। সেই আভিজাত্যের পরম নিশানা বা চিহ্ন হয়ে ওঠে গায়ের রং ; বস্তুত গৌরবর্ণ সমীকৃত হয় আভিজাত্যের সঙ্গে আর প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে আভিজাত্য সমীকৃত হয় সমুন্নত নৈতিক বীক্ষার সঙ্গে। সৌন্দর্যের বিচারে মুখের ছাঁদ, দেহের গড়ন, স্বাস্থ্য সবকিছুকে ছাপিয়ে গায়ের রং শেষ পর্যন্ত ঐ শুভ্রতা হয়ে ওঠে অলৌকসামান্য প্রতিভার দ্যোতক, মেধা ও ক্ষমতার পরিচায়ক। এই ধরনের সমীকরণ কেবল রূপকথায় নয়, নরেন্দ্র দেবের সামাজিক গল্পেও চলে আসে। যেমন 'খেলাঘর গল্পে', শৈল বেশ সুন্দরী মেয়ে কিন্তু নীলা ছিল কালো। 'পরাগ ও রেণু' উপন্যাসে উমা অভিজাত বংশের মেয়ে না হয়েও যে রাজপুত্রের বরণীয়া হওয়ার যোগ্য তা তার 'সুগৌর চরণ' থেকেই বোঝা যায় ; সদাশয়া, সহৃদয়া, দানশীলা, নিরহঙ্কারী—অথচ আভিজাত্যের মর্যাদায় মহিমান্বিতা রাজাবাহাদুরের বোন পিসীমার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। পরাগের বন্ধু রাণুও অতি অবশ্যই রাজকুমারী এবং সুন্দরী রং সম্পর্কে এই বদ্ধমূল সংস্কার কত গভীরে কাজ করে তার একটি নমুনা পাঁচশো বছর আগের গল্প। গল্পে বিবৃত হচ্ছে ভাস্কোডাগামার নৌ-অভিযানের সূত্রে ভারতবর্ষ কীভাবে বিদেশীর উপনিবেশে পরিণত হল, সেই নিষ্ঠুর কাহিনী, সেই গল্পেও আফ্রিকাবাসীদের বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে : 'সে এক কালো কুচ্‌কুচে কাফ্রীর দেশ। যমদূতের মতো তাদের কষ্টিপাথর-এ গড়া চেহারা।' এ ধরনের বর্ণনা বা চিত্রণ বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যে, এমন-কি এখনও খুঁজলেই শয়ে শয়ে মিলবে। নরেন্দ্র দেব কোনো ব্যতিক্রম নন। কিন্তু তাঁর কয়েকটা রূপকথা অন্য এক দিক থেকে আশ্চর্যভাবে আলাদা এবং নতুন। এদের কেন্দ্রে আছে নিষিদ্ধ প্রণয় ; কোথাও খোলাখুলিভাবে কিছু না বলা হলেও চাপা যৌনতার আভাস কিশোর পাঠকের মনে ঠিকই এসে পৌঁছায়। 'ভাইবোন' গল্পে বোন কোনোমতেই দাদার কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে চায় না, একান্ত কর্তব্যবশত বাধ্য হয়েই দাদা এক প্রতিবেশী রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। বিয়ের দিনে দুই পক্ষের বিবাদের ফলে বোনের দেশে দাদার আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক দুর্বার

টানে সে ছদ্মবেশে এসে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে বোন নিক্ষিপ্ত হয়েছে কারাগারে। অবাধে কারাগারে ঢোকার জন্যে এক রাজপুরুষকে অতর্কিতে আঘাত হেনে ভিনদেশী রাজপুত্র তার পোশাক কেড়ে নেয়। কিন্তু অন্ধকারে সে খেয়াল করে না যে সেই রাজপুরুষই তার বোনের স্বামী! ঐ পোশাকে কারাগারে ঢুকতে দেখে, চিনতে না পেরে স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর বোন দাদার বুকে ছুরি গেঁথে দেয়। সম্বিৎ ফিরতে তার পক্ষে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই ট্রাজিক ত্রিকোণ সম্পর্কের গল্পটিতে মুখ্য নায়ক-নায়িকা ভাইবোন; তাদের অসচেতন ও গোপন অনুরাগই গল্পটিকে টেনে নিয়ে গেছে অনিবার্য পরিণতির দিকে। 'রাখালদা এবং লাবু' গল্পেও দেখি, জন্মসূত্রে ভাই বোন না হলেও গল্পের প্রধান পাত্রপাত্রীরা ভাইবোনের মতো একই সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারা পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছোটোদের জন্য লিখিত সামাজিক গল্পে নরেন্দ্র দেব প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন না, কিন্তু রূপকথায় ফ্যান্টাসির ঘোড়াকে জায়গা করে দেন। রূপকথার ঐ স্বাধীনতাটুকুর সদ্ব্যবহার করবার জন্যেই হয়তো তিনি এতগুলো একই ধরনের গল্প লিখে গেছেন।

'কাঠের পুতুল' উপন্যাসটি একেবারেই আলাদা জাতের এক রূপকথা। এক গুণী খোদাইকর কাঠের পুতুল বানায়, পিনোসিয়োর মতো তার নাকটাও বেহিসেবি লম্বা হয়ে যায়। পিনোসিয়োর মতোই দুর্দান্ত সে, তাকে কোনোমতেই বাগ মানাতে পারে না তার জন্মদাতা। কাঠের পুতুল—খোদাইকর যার নাম রেখেছিল 'বাজীকর'—ছুটে চলে আপন খেয়ালে। কিন্তু খানিক পরেই বোঝা যায় প্রথমটায় তাকে যেমন স্বার্থপর বন্নাছাড়া মনে হয়েছিল, আসলে সে তেমন নয়। এক খেলায় বাজীর খেলা দেখিয়ে একশো টাকা রোজগার করেই তার দীন দরিদ্র হতভাগ্য বাবার কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু মাঝপথে দুই ঠগবাজের পাল্লায় পড়ে, মাটিতে টাকা পুঁতে টাকার গাছ ফলাবার লোভে পুরো রোজগারটাই সে খোয়ায়। সেই পাণ্ডববর্জিত ধূ-ধূ মাঠে দাঁড়িয়ে সে যখন হাহাকার করছে তখন এক পাগলির সঙ্গে তার দেখা হয়। এইভাবে সেও তার সর্বস্ব হারিয়েছিল। হারানো গয়নার শোকে তার মাথা গেছে বিগড়ে। কিন্তু সেই পাগলির কাছ থেকেই বাজীকর পায় পথনির্দেশ। পাগলি তাকে বলে, 'এখন আমি বুঝেছি টাকাপয়সাই বলো আর গয়নাগাঁটিই বলো, এসব বাড়াতে হলে

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হবে, আর হিসেবমতো খরচ করে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে হবে। সুতরাং প্রথমে শেখা দরকার সৎ পথে থেকে সৎভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় কী উপায়ে? পরিশ্রমে যে পরাঙ্মুখ তার দারিদ্র্য কোনোকালেই ঘোচে না।' এক বিশেষ নৈতিক বীক্ষা গল্পের কাঠামোটি আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত করছে। কাহিনীর বিবেকস্বরূপ পাগলি আদৌ কোনো প্রান্তবর্তী চরিত্র নয়, লেখকের অভিপ্রায় মোদ্দা নীতিকথাটিকে বিশদভাবে জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেই তার, লেখকের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই নয় সে। পুরো গল্পটা জুড়ে থাকে লেখক-এর দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রতিহত আধিপত্য; কোনো-ভাবেই কোনোমতেই বিপর্যস্ত হয় না তা; বিসংগত স্বরের ঘাতপ্রতিঘাতে গল্পটিতে কোথাও সত্যিকারের সংঘাত ঘনিয়ে ওঠে না; আখ্যানগত বদ্ধতা কাহিনীটিকে করে তোলে মসৃণ ও একমাত্রিক। স্পষ্টতই বিভিন্ন চরিত্র কথা বললেও উপন্যাসটিতে উক্তির বহুলতার কোনো জায়গা নেই, বিনিময়ের দ্বিপাক্ষিকতা স্বীকৃত হয়নি একে-বারেই। ফলে বাজীকর নামের কাঠের পুতুলটি আক্ষরিক এবং আলংকারিক অর্থেই কাঠের পুতুল হয়ে ওঠে, তার নিজস্ব স্বরের কোনো হদিশ মেলে না।

নরেন্দ্র দেবের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখা পরাগ ও রেণু নামের সামাজিক উপ-ন্যাসটি। উপন্যাসটি পাঠশালায় দু বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ সংস্করণের (১৯৪৪) নিবেদনে নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন: 'কিশোর বয়সে একখানি প্রসিদ্ধ বিদেশী উপন্যাস পড়ে একদা মুগ্ধ হয়েছিলুম। পাঠশালার ছেলেমেয়েদের অনু-রোধে যখন তাদের একটি বড় গল্প শোনাতে বসলুম তখন সেই ছেলেবেলায় পড়া বিদেশী কাহিনীটি ঘুরেফিরে মনের মধ্যে উঁকি মারায় এই উপন্যাসের আখ্যানভাগের মধ্যে তার প্রভাব একটু বেশি মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করেছে। পরাগ ও রেণুর আখ্যান-ভাগের সঙ্গে বিদেশী প্রসিদ্ধ উপন্যাসের প্রায় হুবহু সাদৃশ্য আছে সেটি হল ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সেস হজসন বার্টেট লিখিত লিটল লর্ড ফনটেলরের, মূল উপন্যাসে সেদ্রিক এরল ন্যুইয়র্ক শহরের ছেলে, অল্প বয়সেই বাবাকে হারিয়ে সে মায়ের কাছ থেকে অবাধ স্নেহ পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগড়ে যায়নি, তার ব্যবহারের গুণে সবাইকে সে কাছে টেনে নেয়, কাউকেই হীন চোখে দেখে না সে। তার পরম বন্ধু মুদিখানার এক মালিক ঘোর রিপাবলিকান সেই ব্যক্তিটি তার এক আদর্শ স্বরূপ। কিন্তু হঠাৎই একদিন সেদ্রিক জানতে পারে যে এক ইংরেজ লর্ড-এর পৌত্র এক মার্কিনী মহিলাকে বিয়ে করবার অপরাধে সেদ্রিকের পিতামহ

সেদ্রিকের বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। পিতামহের হুকুমে সেদ্রিককে ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিতে হয়, সঙ্গে মা থাকলেও ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে তাদের বাসা আলাদা জায়গায় হয়—মার্কিনী মহিলাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে বৃদ্ধ নারাজ, তাই তাঁকে সেদ্রিকের কাছ থেকে খানিক দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু কোমল স্বভাব সেদ্রিকের প্রভাবে বদমেজাজী, অনাচারী, উচ্ছৃঙ্খল পিতামহের হার্দ্য পরিবর্তন ঘটে; পৌত্রের কল্যাণে জমিদারির অবস্থাও ফিরে আসে, প্রজারা সবাই একবাক্যে ধন্য ধন্য করে ওঠে। এরপরে সেদ্রিক সম্পত্তি-সংক্রান্ত এক চক্রান্তে জড়িয়ে পড়লে তার রিপাবলিকান বন্ধুটি তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। সব গোলমাল চুকে গেলে সেদ্রিকের পিতামহ পুত্রবধূকে সাদরে গ্রহণ করে নেন—এতদিনে তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, সেদ্রিকের মার চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি—এবং সেদ্রিকের রিপাবলিকান বন্ধুটিও মত পাল্টিয়ে ইংরেজ অভিজাতবর্গের সমর্থকে পরিণত হয়ে যায়। মূল উপন্যাসের মতোই পরাগ ও রেণুর কাহিনীর বিন্যাস সাধারণ ঘরের মেয়ে দরিদ্র উমাকে বিয়ে করার জন্যে লক্ষ্মীপুরের দোর্দণ্ড-প্রতাপ জমিদার রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র রায় তাঁর বড় ছেলে কুমার রণেন্দ্র রায়কে ত্যাজ্য করেছেন। অকালে গত রণেন্দ্রের অপাপবিদ্ধ কোমলচিত্ত ছেলে পরাগ বড় হয় কলকাতায়। সেখানে এক স্টেশনারি দোকানের মালিক কাশীবাবুর সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব, পরজীবী জমিদারেরা যে কত অপদার্থ, পদমর্যাদা আর ধনগৌরব, মিথ্যে আভিজাত্যের অহংকার তাদের যে কত অন্তঃসারশূন্য করে তুলছে সে সম্পর্কে প্রায় রোজ তিনি পরাগকে বক্তৃতা দেন। পরবর্তী ঘটনাগুলোও মূল উপন্যাসের অনুরূপ। আখ্যানগত সাদৃশ্যের চেয়ে লিটল লর্ড ফনটেলরের সঙ্গে পরাগ ও রেণুর মতা-দর্শগত মিল ও অমিলই আমাদের আলোচ্য বিষয়। উপন্যাসের গোড়াতে কালীবাবু জমিদার রণেন্দ্রর এক আপসহীন সমালোচক; তাঁর মতামতের খানিকটা আঁচ করতে পেরেই লক্ষ্মীপুরের দেওয়ানজীর সন্দেহ হয় যে লোকটা নিশ্চয়ই রাশিয়ার সোভিয়েট আদর্শের অনুরাগী, কালীবাবুর আদর্শের একেবারে বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র রায়: বেহিসেবি, অত্যাচারী জমিদার তিনি, তাঁর ষোলো-আনার ওপর আঠারো-আনার বংশ কৌলীন্যের অভিমান। এই দুই বিপরীত প্রান্তের মাঝখানে আছে নেপথ্যচারিণী উমার শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠা পরাগ। পরাগ কিন্তু তা সত্ত্বেও এক শূন্য আধার মাত্র, আধেয়বিহীন এক শূন্য চিহ্ন tabula rasa; দুই উল্টোমুখী মতাদর্শের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে আপসহীন মীমাংসায় পৌঁছবার

জন্য এক দরকারি সূত্র সে, সামঞ্জস্য বিধানের এক হাতিয়ার কেবল। পরাগকে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের নায়ক বলে মনে হলেও, তা নেহাৎই আপাত। পরাগের অপরিসীম সারল্য ও করুণা একদিকে যেমন কাশীবাবুকে তাঁর উগ্র মতামতের চড়া সুরটাকে নামিয়ে নিতে সাহায্য করে তেমনি অন্যদিকে, রাশভারী গর্বোদ্ধত জমিদারকে করে তোলে দয়ালু, পরহিতাকাঙ্ক্ষী। শেষ পর্যন্ত জমিদারতন্ত্রের সমালোচনা থেকে সরে এসে উপন্যাসটি একটি মধ্যবিন্দুতে জায়গা করে নেয় : সেখানে 'মন্দ' জমিদার যেমন তেমনি 'ভালো' জমিদারও সম্ভব। যে বিপুল বিত্তের অধিকারী জমিদার তা যদি প্রজার কল্যাণে সৎ ও নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় হয়, জমিদার যদি ন্যায়-পরায়ণ অছি হয়ে ওঠেন, তাহলে মূল ব্যবস্থাপনার রদবদলের কোনো দরকার নেই। কালীবাবু অবশ্য এই দাতব্যকর্মে সন্তুষ্ট নন। তিনি চান সেই বিত্ত পরিণত হোক পুঁজিতে, দেশে নানা কারখানা গড়ে উঠুক। দেখা দিক বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ, জমিদার খোলস পাল্টে পরিণত হোক পুঁজিপতিতে। নব্য যুগের প্রতিনিধি দেওয়ানজীর নাতি নিতাই প্রবল প্রতাপ জমিদারের মুখের ওপর বলে : 'ধনী ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজা কেউ কারুর চেয়ে হীন নয়। নিতাই এদের মর্যাদা নিয়ে কথা বলে, কিন্তু সম্পদের অসম বণ্টন সম্পর্কে তার কোনো আপত্তি নেই। শ্রম ও উপার্জনের ওপর নরেন্দ্র দেব যে বিভিন্ন লেখায় জোর দিয়ে এসেছেন তার মতাদর্শগত তাৎপর্য এতেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বসুধারা কাব্যগ্রন্থে 'স্বামীজী' কবিতাতেও তিনি লিখেছিলেন : 'কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা বিজ্ঞানের বহুল প্রচার— / ঘুচাইব দেশ-দৈন্য, দুর্বলতা যত—অসমের শূন্য হাহাকার, / ভাগ্যহীন ভারতেরে পূর্ণ করি পুনরায় ষড়ৈশ্বর্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।' অভিজাত অথচ বুর্জোয়া, সংস্কৃতমনস্ক অথচ নিরহঙ্কারী মানুষই ছিল নরেন্দ্র দেবের ভবিষ্যৎ আদর্শ মানুষ, পশ্চিমি উদার নৈতিকতাবাদের এক দেশীয় সংস্করণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল তাঁর বিশ্বাসের জগৎ। তাই সোভিয়েত রাশিয়া, চীন-বিপ্লবের প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের সামাজিক রূপান্তরকেই তিনি ভারতবর্ষের মডেল হিসাবে ভাবতে চেয়েছেন, উপন্যাস লিখতে বসে তিনি যে লিটল লর্ড ফনটেলরকেই বেছে নিয়ে-ছিলেন তা আদৌ কাকতালীয় ছিল না। নরেন্দ্র দেব কোনোভাবেই উচ্চবর্গীয় চিন্তার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। নিম্নবর্গের মানুষকে তিনি কখনোই ইতি-হাসের শক্তি, বিষয়ী হিসেবে কল্পনা করতে পারেননি। একথা মনে রাখলে পাঠ-শালার বিশ্ববার্তার এ ধরনের ইঙ্গিতে তার খটকা লাগে না, চীন-জাপান যুদ্ধ প্রসঙ্গে

সেখানে লেখা হয়েছে : 'চীনের প্রধানমন্ত্রী চ্যাং-চি-চুং বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালাচ্ছেন, সমগ্র সেনাবাহিনীর নয় অনেকটা যেন রূপকথার বীরদের মতো একাই লড়ছেন প্রধানমন্ত্রী। নতুন যুগের পরাগেরা যে মূঢ় ম্লান, মূক মুখ নিম্নবর্গীয়দের ভাষা জোগাবে নিচুতলার মানুষেরা চিরদিনই যে উচ্চবর্গীয়দের অপার বদান্যতায় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত থাকবে, এই বদ্ধমূল সংস্কার আরো অনেক জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মতো নরেন্দ্র দেবেরও ছিল, তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে তাঁর মননে-সাহিত্যে। তাই পরাগ ও রেণু উপন্যাসে কালীবাবু যিনি সমস্ত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে সারাক্ষণ তীব্র সমালোচনা করে এসেছেন, মাখন ময়রাকে বলেন : ময়রার ছেলে হলে হবে কি, তোমার মতন সাচ্চা মানুষ ভদ্রলোকের সমাজেও নেই, তখন তা নিছক অসতর্ক উক্তি বলে মনে হয় না। কিন্তু তা হলেও তাঁর মতাদর্শগত বদ্ধতা সত্ত্বেও নরেন্দ্র দেব যা চেষ্টা করে গিয়েছিলেন তার মূল্য অপরিসীম। আজকে যখন দেখি, পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর কুৎকৌশল শেখানোই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মুখ্য লক্ষ্য, সমকালীন প্রসঙ্গ থেকে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে শিশুসাহিত্য হয়ে উঠেছে একান্তই বাস্তব-বর্জিত, পুনরুক্তিময় ও নিষ্প্রাণ, তখন 'পাঠশালা'র সম্পাদকের দিকে ফিরে তাকাতেই হয়, জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন প্রথার অঙ্গ হিসেবে নয়, কেবল নিয়মরক্ষার খাতিরে নয়, অন্তরের তাগিদেই তাঁকে জানাতে হয় সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রাজমধ্যবর্তিন নরেন্দ্র দেব

স্বপন মজুমদার

যখন দেশ ও বিদেশ, সদর ও অন্দর, নূতন ও পুরাতনে তৈরি হয়ে ওঠে কোন আড়াল, সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা তখনই দেখি, অপরিচয়ের সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে উদ্ভব হয় এমন এক সম্প্রদায়ের, ইতিহাসের পরিভাষায় যাঁদের বলা যায় মধ্যবর্তিন বা intermediaries। ইতিহাস তাঁদের মহৎ সৃজনশীল সাহিত্যিকের সমান গৌরব দেয় না, তাঁরাও প্রত্যাশা করেন না অনুরূপ সম্মানের, নিজেদের সরিয়ে রাখেন নেপথ্যে। তবে অভিমানবশত নয়, আর তাই স্বধৃত ব্রত থেকে বিরত হন না এঁরা শেষ পর্যন্ত। যে-কোন সাহিত্য-ইতিহাসের বুনিয়াদ গেঁথে তোলেন এঁরা। যদিও জানেন, সৃজনমূল্যে তাঁদের পরিচয় স্থায়ী হবে না হয়ত, তা সত্ত্বেও তাঁরা বেছে নেন সাহিত্যের পাঠক তৈরির দায়িত্ব, পাঠকের মনের পরিধি আর সংবেদনের সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার ভূমিকাই প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে নেন তাঁরা। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা দেখি, সৃজন ও পরিচয়ের যৌথ দায়িত্ব বহন ক'রে চলেছিলেন সৃজনশীল লেখকেরাই। কিন্তু শতাব্দীশেষে শিল্পীর ধারণা বিবর্তিত হ'তে শুরু করার পর থেকে সৃজনশীল ও মধ্যবর্তিন লেখকের অভীষ্ট পাঠক-সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হয়ে যায়। মধ্যবর্তীদের পরিচর্যায় গঠিতরুচি পাঠক স্নাতক হন সাহিত্যের নিখিলে।

তিরিশের দশকে বাঙলা সাহিত্যে প্রতীচ্য আধুনিকতার প্রতিফলিত ঔজ্জ্বল্যে বিমোহিত হয়ে আমরা যদিও শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের সাহিত্যিকদের সুকৃতি প্রায় ভুলতে বসেছি, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়েও এ-সাহিত্যের শিকড় ছিন্নমূল হয়ে যায়নি প্রধানত এঁদেরই অনুরক্ত শুশ্রূষায়। নতুন শতাব্দীর পাঠকদের এঁরাই পরিচয় করিয়েছিলেন, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য-ঐতিহ্যের মূল উপপাদ্য ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে। এবং এই পরিচয় করানোর কাজ তাঁরা সমাধা করেছিলেন নীরবে, প্রচারবিহীন। এঁদেরই সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালি পাঠক কেবলমাত্র বাঙলা ভাষার

মাধ্যমেই পরিচিত হতে পারতেন জগৎ ও জীবনের সেইসব বোধ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে, যার আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠত মানবিক অনুভূতি, অর্থময় মাত্রা পেত অস্তিত্ববুদ্ধি। দেশপ্রেম বিষয়ে উনিশ শতকীয় বীরগাথা তাঁরা হয়ত আর রচনা করতে উৎসাহ পাননি, কিন্তু সাহিত্য-সম্পৃক্ত সব কাজই যেন তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল দেশসেবারই নামান্তর। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বসূরীদের অস্বীকার বা আবহমান বাঙলা সাহিত্যকে অবজ্ঞা করতে হয়নি তাঁদের। অথবা নিতান্ত শোকবিয়োগের বিহ্বল উপলক্ষ ছাড়া বন্ধুপ্রশস্তির সংকীর্তনে প্রগল্‌ভ হননি তাঁরা বা বন্ধুবিচ্ছেদেও মাতেননি তরজায়।

এই যুগমানসতার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্বস্তভাবে ফুটে উঠেছিল নরেন্দ্র দেবের (১৮৮৮-১৯৭১) মধ্যে। বাঙলা সাহিত্যসমাজে তাঁর পরিচয় হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে, 'গল্পভারতী' পর্যন্ত অব্যাহত ছিল সেই প্রতিষ্ঠা। ভারতী-যুগের এক প্রান্তে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্যে'র প্রাচীনপন্থা, অন্য প্রান্তে নবীনপ্রাণ 'কল্লোল'। একদিকে 'নায়কে'র সনাতনপন্থী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে 'প্রগতি'র বুদ্ধদেব বসু। আর সমকালে সমান্তর চলেছে 'ভারতবর্ষ', 'জাহ্নবী', 'যমুনা'। সাময়িক সাহিত্যের এই পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়েই পরিণত হয়েছে নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যজীবন। এমন কোলাহলময় ও বর্জনপ্রবণকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক সার্থক মধ্যবর্তিন ও সাহিত্যিকদের মিলনসূত্র।

একাধিক অর্থেই নরেন্দ্র দেব ছিলেন মধ্যবর্তিন। শুধু সাহিত্যকর্মেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্যসমাজের মিলনকেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, দুজনের কাছেই দেবদম্পতি ছিলেন অবারিতদ্বার। স্তাবকেরা যখন দূষিত ক'রে তুলবার উপক্রম করেছিল উভয়ের সম্পর্ক, এঁদেরই মধ্যস্থতায় প্রশমিত হয় সে-উত্তেজনা। সমকালে ত বটেই, এমনকি তাঁদের তিরোধানের পরেও, একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য উপভোগের মতো রুচির প্রসারতা—এবং অবশ্যই সে-আনন্দ স্বীকারের মতো বলিষ্ঠতা—বেশি সাহিত্যিকের ছিল না বাঙলা-দেশে। নরেন্দ্র দেব ব্যতিক্রম ছিলেন এক্ষেত্রে। শরৎচন্দ্রের জীবৎকালেই তাঁর জীবনী ('সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' ১৯৩৭) রচনা ও সম্মাননাগ্রন্থ ('শরৎ-বন্দনা' ১৯৩২) সংকলন করেছিলেন তিনি। আর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সংকলনের বাসনা ছিল 'রবিদ্যুতি' নামে। কেবল এঁদের দুজনের ক্ষেত্রেই নয়, প্রমথ চৌধুরীর মতো অভিজাতের সান্নিধ্য তাঁকে জলধর সেনের অনুরাগী হ'তে

বাধা সৃষ্টি করেনি। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান লেখক হওয়া সত্ত্বেও,'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র লেখকদের সঙ্গে তাঁর আড্ডাধারীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে দেরি হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সমকালীনদের মধ্যে জলধর সেন যেমন হয়ে উঠেছিলেন সকলের 'দাদা', তাঁর পরের প্রজন্মে সেই স্থান অধিকার করেছিলেন নরেন্দ্র দেব—বাঙলা সাহিত্যের প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে তিনি হয়ে উঠেছিলেন তিন পুরুষের সংযোগসূত্র।

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেই নয়, তাঁর সম্পাদনকর্মেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামের কবিতা-সংকলন 'কাব্য-দীপালি'তে (প্রকাশ ১৯২৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩১) রবীন্দ্রনাথ থেকে গ্রন্থপ্রকাশকালীন তরুণতম কবি মৈত্রেয়ী দেবী (জন্ম ১৯১৪) পর্যন্ত স্থান পান সসম্মানে। ব্যক্তিগত মত বিশ্বাস বা রুচি কখনও বাধা হয়ে ওঠে না তাঁর সম্পাদকীয় নির্বাচনে। সংকলনটির লেখকসূচি[১] বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই বৈশিষ্ট্য;—বিশেষ ক'রে মহিলা-কবির সংখ্যা ও গুরুত্ব সেযুগের পক্ষে মনে হয় বিস্ময়কর। আরও একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে 'কাব্য-দীপালি'। আধুনিক কবিতার সংকলন একাধিক কবি করেছেন এ-যুগে; কিন্তু তিনিই প্রথম তাঁর শিল্পী-বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কবিতা অনুসরণ ক'রে ছবি আঁকতে।[২] কবিতা ও ছবি—এই দুই জগতের শিল্পীদের মধ্যে আদানপ্রদানেও নরেন্দ্র দেবের ভূমিকা ছিল সংযোগকারীর। যদিও স্বতন্ত্র-ভাবে তাঁর 'মেঘদূত' অনুবাদে গ্রথিত চিত্রাবলির গৌরব কম নয়, অনুবাদের সঙ্গ পেয়ে সেগুলি হয়ে উঠেছিল যেন এক যুগলবন্দী।

কবিতা-সংকলনে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি, তাঁর লক্ষ্য ছিল, 'এ-যুগের যত কবি / এনেছে তাদের পূজার অর্ঘ্য' তাঁদের সকলেরই কবিকৃতির নিদর্শন একটি গ্রন্থে পরিবেশন করা। রসবিচারের কঠিন মানের প্রয়োগ সেখানে তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু 'কথাশিল্পে'র (১৯৪৬) লেখক নির্বাচনে প্রকাশ পায় তাঁর অভ্রান্ত জহুরীমন।[৩] এই সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদকযুগল যা লিখেছিলেন, তাকেই বলা যায় তাঁদের সাহিত্যচর্চার মূল প্রেরণা: 'জনসাধারণের বিচারে বা তাঁদের ভালো লাগা-না লাগার উপর কথা-শিল্পীর যোগ্যতা ও প্রতিভার তারতম্য নির্ভর করে না। তবে একথাও একেবারে অস্বীকার করা চলে না যে পাঠক-সমাজের রুচি ও রসবোধকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও কোনো রচনার সার্থকতা লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা চাই সেই পাঠক সমাজেরও রুচি ও রসবোধ যাতে

এই সঙ্গে কতকটা পরিচ্ছন্ন ও উন্নত হয়ে ওঠে (পৃ. ৫)। পাঠক-সাধারণকে রসবোধে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশে তাঁরা আহ্বান করেন পাঠকদের অভিমত, 'লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবিধার জন্য তাঁদের আলেখ্য, স্বাক্ষর ও স্বল্প জীবনীও' সংকলিত করে দেন গল্পগুলির সঙ্গে। এইভাবে লেখক-পাঠকের মধ্যে এক সংযোগের সেতুও গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নরেন্দ্র দেব।

'কথাশিল্পে'র প্রকাশ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে আরও একটি কারণে। বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাহিত্য-সমাজের সম্পর্ক স্থাপনেরও একটি উজ্জ্বল নজির এই সংকলনের প্রযোজনা। এবং এই আয়োজনেও প্রধান মধ্যবর্তিন ছিলেন নরেন্দ্র দেব, ব্যক্তিগত জীবনে একটি রাসায়নিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রচার-অধ্যক্ষ। অপূর্ব উদ্ভাবন আর সাহিত্যরুচির সমাহারে তাঁর বিজ্ঞাপন-ভাবনাও হয়েউঠেছিল অভিনব। গ্রন্থশেষে প্রতিটি গল্পনাম অবলম্বন করে অনতিদীর্ঘ লেখপুঞ্জে প্রচারিত হয়েছিল বিজ্ঞাপন। আর সেই সুবাদেই ১৯৪৬ সালেও ৪০০০ শব্দের একটি গল্পের জন্য গল্প-কারকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল 'তদানীন্তন প্রচলিত দক্ষিণার চতুর্গুণ' একশো টাকা ও পাঠকের বিচারে শ্রেষ্ঠ তিনটি রচনাকে সাকুল্যে এক হাজার টাকার পুরস্কার। এই-ভাবে লেখক-সমাজের অর্থ নৈতিক মান উন্নতিতেও তাঁর ভূমিকা ছিল পথিকৃতের।

শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সমাযোজনেই মধ্যবর্তিন ছিলেন না নরেন্দ্র দেব, বয়ঃসন্ধির দুরাকাঙ্ক্ষ ভবিষ্যৎ লেখকদেরও পরম নির্ভর ছিল তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'পাঠশালা' (১৯৩৭)। 'লেখক গড়া' আর 'মানুষ গড়া'—এ দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না তাঁর চিন্তায়। পত্রী-মৈত্রী, শব্দ-সন্ধান, প্রশ্নোত্তর, ধাঁধা, অক্ষরক্রীড়া, দেশবিদেশের সংবাদ আর পাঠশালা-পঞ্চায়েৎ বা সাহিত্য সঙ্গীত খেলাধুলার পাঠচক্র ও বিতর্কবাসর আর তারই উত্তরসূরী সাহিত্যার্চনীর বিচিত্র বিদ্যার চর্চায় খ্যাতকীর্তি গুণীদের সান্নিধ্যে পরিণত ও পুষ্ট হয়ে উঠবে প্রকাশ-উন্মুখ কিশোরমন—এ-বিশ্বাস থেকেই তিনি লিখেছিলেন: 'তোমরা তরুণ যাত্রী সাহিত্যের দুর্গম দেউলে। / তোমাদের অনুরোধ—এ কথা যেও না কভু ভুলে— / ···হে অখ্যাত বন্ধুগণ, তোমাদের এ দান তুচ্ছ না। / অজ্ঞাত যাহারা আজি তাহাদেরই কণ্ঠে উঠে বাজি / যুগ-শঙ্খ যুগে যুগে।'[৪] তাঁর শিশুসাহিত্যের: 'গৌতমের গতজন্ম' (?), 'অনেক দিনের অনেক কথা' (১৯৫৪) বা 'জন্মজন্মান্তরের কাহিনী' (১৯৫৮), 'গল্প বলি শোনো শোনো' (১৯৬৮) বা গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত 'দাদুর গল্পে'র উদ্দিষ্ট পাঠক ছিল এরাই।

মধ্যবর্তিনের ভূমিকায় নরেন্দ্র দেবের পরিচয় অবশ্য প্রধানত নির্ভর ক'রে আছে তাঁর অনুবাদকর্মের ওপর। ওমর খৈয়ামের 'রুবাই', হাফিজের 'দিওয়ান' ও 'মেঘদূতে'র দুটি অনুবাদ তাঁকে বাঙালি পাঠকের আত্মীয় করে তুলেছিল। এ-কাজে তাঁর অনুশীলনের অভাব ছিল না।

কিন্তু জ্ঞানের তুলনায় অনুভবের গভীরতায়ই তাঁর আস্থা ছিল বেশি। এবং এ-কাজে বাঙলা ভাষার স্বভাব আর বাঙালি পাঠকের রুচি এ দুটিকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন তিনি সহজাত রসবোধে। তাই, মূলের সঙ্গে পদে-পদে সাযুজ্য রক্ষা করতে গিয়ে বা তত্ত্বভারে তিনি পাঠকের পক্ষে দুষ্পাচ্য কোন পাঠ সৃষ্টি করেননি; আর সেই গুণেই পাঠকের স্মৃতিতে স্থায়ী আসন পেয়েছিল তাঁর অনুবাদ। ওমর, হাফিজ ও কালিদাস এই তিন আপাত অসবর্ণ কবির নির্বাচনের মধ্যেও দেখা যাবে মধ্যবর্তিন হিসেবে তাঁর মনের প্রসারতা। অনুবাদক হিসেবে তাঁর পরিচয়ের আর একটি মাত্রা লুপ্ত হয়ে গেছে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' অনুবাদের পাণ্ডুলিপির বিলুপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে। অনুবাদ ছাড়াও, তাঁর দুটি বড়দের উপন্যাস 'গরমিল' (১৯২৫) ও 'আকাশকুসুম' (১৯৩৭) ও কিশোরপাঠ্য 'পরাগ ও রেণু' (১৯৪৪) রচিত হয়েছিল বেয়র্নসন, ইবসেন প্রমুখ বিদেশি লেখকদের রচনার আধারে, যদিও অপরিচয়ের দূরত্ব তিনি দূর করে দিয়েছিলেন সমাজপট ও চরিত্র-ভাবের রূপান্তর ঘটিয়ে।

ভ্রমণসাহিত্যের মধ্য দিয়েও নরেন্দ্র দেবের মধ্যবর্তিনের স্বভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'রাজপুতের দেশে' (?), 'সাহেব বিবির দেশে' (১৯৫৬) 'কবিতীর্থ' (১৯৬০) বা গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য পরিকল্পিত, 'বিলিতি মাটি' ও 'তথাগতের পথে'র মধ্যে শুধু বস্তুসঞ্চয়ই প্রধান হয়ে ওঠেনি; তাঁর পাঠকের মনে তিনি সঞ্চার ক'রে দিতে চেয়েছেন অপরিচিতের, মহৎ কীর্তির সান্নিধ্যের উত্তাপ। কিন্তু সেখানেও প্রধান হয়ে ওঠে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রসঙ্গ। তাঁর য়ুরোপ তাই কবিতীর্থ—ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, কীট্স্, স্কট, সাদে, কোলরিজ, শেলি, ব্রাউনিং দম্পতি, শেক্সপীয়র, শিলার, টলস্টয় আর ওয়েস্টমিন্স্টারের পোয়েট্স্ কর্নার অবলম্বন ক'রে তৈরি হয় তাঁর তীর্থভ্রমণসূচি।

শুধু সাহিত্যের—তার স্রষ্টা ও ভোক্তার—ত্রিভুজের মধ্যেই সীমায়িত ছিল না নরেন্দ্র দেবের কৌতূহলী মন। অন্য শিল্পমাধ্যমের প্রতিও ছিল তাঁর অপার জিজ্ঞাসা। বাঙলায় চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটির ('সিনেমা, ছায়ার মায়ার

বিচিত্র রহস্য' ১৯৩৪) লেখক তিনিই। নাট্যসাপ্তাহিক 'নাচঘরের' এককালীন সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন তিনি; প্রথম বাঙলা চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিক 'বায়স্কোপে'রও পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন তিনি। তিনিই সংকলন করেন উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণের য়ুরোপ-বিজয়ের সচিত্র বিবরণ (ভারতবর্ষ, ১৩৪৩), এপ্স্টাইন ও নবযুগের ভাস্কর্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করান তিনি (ভারতবর্ষ, ১৩৪৩)। অবশ্য এরও মূলে ছিল নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, বন্ধুবর্গের কাজ বিষয়ে জানবার উৎসাহ এবং অবশ্যই সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে তার সঙ্গে পরিচয় করানোর এক উৎকণ্ঠা।

সৃজনশীল লেখক আত্মমগ্ন হয়ে থাকতে পারেন, তা-ই তাঁর অভিপ্রেত। কিন্তু মধ্যবর্তিন পরার্থপ্রবণ, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সমাযোজনেই তাঁর চরিতার্থতা। এই মনোভাব থেকেই তিনি মেতে থাকতেন, যাকে তিনি বলেছেন 'খুচরো জিনিসের খামখেয়ালি' ('ভারতবর্ষ' ১৩৩২) নিয়ে। তিনি দেশবিদেশের খবর সংকলন করেন "নিখিল প্রবাহ" নামে, বিশ্বসাহিত্যের সংবাদভাষ্য পরিবেশন করেন, প্রত্নতত্ত্ব আর ভূগোলের বিস্ময় উদ্‌ঘাটন করেন "অতীতের ঐশ্বর্য" বা "দেশের কথা" ধারা-বাহিক রচনায়, জল্পনা করেন নতুন-নতুন ধাঁধা। তাছাড়াও বহু নানা রসের ব্যঙ্গরচনায় স্বনামে বা ছদ্মনামেও তাঁকে উপস্থিত দেখি আমরা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। এমনই সব বিষয়বিস্তার বাঙলা ভাষার পাঠককুলকে সদর্থে করে তুলেছিল আন্তর্জাতিক। আর তা সম্ভব হয়েছিল নরেন্দ্র দেবের মতো মধ্যবর্তিনদের সহায়তায় ও সংকলনদক্ষতায়।

এই কাজের নেশা আর ভালোবাসা যতই গভীর হয়েছে, ততই যেন নিজেকে নেপথ্যে সরিয়ে নিয়েছেন নরেন্দ্র দেব। তাঁর সম্পাদিত কাব্যসংকলনে প্রধানতম অনুপস্থিতি তাঁর নিজের। শরৎ সমিতি বা রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির মতো সংস্থার সংগঠনে তিনি ছিলেন স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও—এবং সেটাই অন্যতম কারণ—এই সংঘগুলি থেকে নিজেকে পুরস্কৃত করার অসৌজন্য কখনও হয়নি তাঁর। 'বাজে' আর 'কাজের' লোকে কোনদিন ভেদ করতে পারেননি তিনি। "হরিজন জাতকের" ('উদয়ন' ১৩৪০) অর্হৎ ব্যর্থ মানুষের বন্ধু হতেও ভয় পাননি। এই ভালোবাসাই তাঁর মধ্যবর্তিন সাহিত্যিকের ভূমিকার মূলে। তাঁর সঞ্চয় ত নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই নয়, অন্যকে সমৃদ্ধ করেই তাঁর তৃপ্তি। বুদ্ধিমানদের আত্মচরিতার্থতার যুগে তাঁকে, তাঁর মতো মানুষের সামর্থ্যকে, ভুল বোঝার আশঙ্কাই বেশি। আর যদি তাই

করি, আমাদের সাহিত্যসমাজ ও সমাজজীবনকে কি আরও দীন করে তুলব না আমরা ?

সম্পূরণ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, হরিশচন্দ্র নিয়োগী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রসন্নময়ী দেবী, নগেন্দ্রবালা দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অনঙ্গমোহিনী দেবী, বিনয়কুমারী বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, রমণীমোহন ঘোষ, রসময় লাহা, জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রজনীকান্ত সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিত্যকৃষ্ণ বসু, প্রমীলা নাগ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অম্বুজাসুন্দরী দেবী, বরদাচরণ মিত্র, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, কিরণচাঁদ দরবেশ, সরোজকুমারী দেবী, রত্নমালা দেবী, লজ্জাবতী বসু, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, সরলাবালা সরকার, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত, মৃণালিনী সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, দেবকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, মৃণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ইন্দিরা দেবী ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র রায়, শশাঙ্কমোহন সেন, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ্মতী দেবী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, লীলাবতী দেবী, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, প্রফুল্লময়ী দেবী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, পরিমলকুমার ঘোষ, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, যোগীন্দ্রনাথ রায়, চণ্ডীচরণ মিত্র, রাধাচরণ চক্রবর্তী, লীলা দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নিরুপমা দেবী, বন্দে আলি মিঞা, হুমায়ুন কবীর, অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গোলাম মোস্তাফা, হেমচন্দ্র বাগচী, বুদ্ধদেব বসু, রাধারানী দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রকুমার লাহা, জসীম উদ্দিন, উমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী এবং অপরাজিতা দেবী।

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র রায়, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অরবিন্দ দত্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এবং গ্রন্থসজ্জায় বিনয়কৃষ্ণ বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন, চারুচন্দ্র রায় ও সমর দে।

৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, "ইতিহাস"; আশাপূর্ণা দেবী, "বাজে খরচ", সুবোধ বসু "আজাদী"; বনফুল, "অর্জুন মণ্ডল"; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বুড়ো হাজরা কথা কয়"; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, "দ্বিখণ্ড"; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, "ফুলেশ্বরী"; সরোজকুমার রায়চৌধুরী, "অকাল বসন্ত", গজেন্দ্রকুমার মিত্র, "প্রেরণা"; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "চক্রান্ত"; অন্নদাশঙ্কর রায় "রূপদর্শন"; প্রবোধকুমার সান্যাল, "প্রশ্ন"; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "কামধেনু" ও বাণী রায়, "ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুরী"।

৪ "সাহিত্যলক্ষ্মীর তরুণ পূজারিদের প্রতি", গীতা সিংহ ভারতী, 'ভালোবাসার দাদু' (কলকাতা ১৯৮৮), পৃ ৯২।

নরেন্দ্র দেবের সিনেমা-ভাবনা

ধ্রুব গুপ্ত

সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বিষয়টি নানা দেশে এ শতাব্দীতে একাধিক ব্যক্তির তন্নিষ্ঠ অনুধাবনের বিষয় হয়েছে। যে সম্পর্ককে মোটামুটি দুদিক থেকে দেখা যায়, (ক) সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র কী শিক্ষা নিয়েছে এবং নিতে পারে, এবং সেখানে উলটোটাও সম্ভব কিনা তাই দেখা (খ) চলচ্চিত্রকাররা পূর্ব লিখিত সাহিত্যিক text কে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন তার আলোচনা। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই সম্পর্ককে ঘিরে মৌখিক ও লিখিত আলোচনাতে সাধারণত যা হয়ে থাকে তা মাঝারি মাপের মানুষের উত্তেজনাপ্রসূত কলহ প্রবণতা মাত্র। অথচ বড় মাপের মানুষদের দিকে তাকালে আমরা দেখি সেখানে একদিকে টলস্টয়-রবীন্দ্রনাথ, অন্য দিকে আইজেনস্টাইন দুই শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা পোষণ করছেন—এবং হাল আমলের 'হুভো রোমাঁ' গ্রুপের লেখকরা এই নিয়ে নতুনভাবে ভাববার সময় কোনোরকম কল্পিত কলহকে মনে স্থানও দিচ্ছেন না। একদিকে আইজেনস্টাইন 'মাদাম বোভারি' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি সহকারে দেখাচ্ছেন সেখানেও তিনি তার মন্তাজ তত্ত্বের কোনো উৎস সন্ধানে রত। অপরপক্ষে রুদ সিমোঁ "ট্রিপটিক" লেখার সময় চলচ্চিত্র দ্বারা কী ভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন তা নিজেই দেখাচ্ছেন। আর উপন্যাস থেকে রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে কী 'মেটামরফোসিস' ঘটে তার বিস্তৃত আলোচনা করছেন জর্জ ব্লুস্টোন।

আমাদের দেশে সাম্প্রতিক পারস্পরিক 'চোখ রাঙানির' অসুস্থ আবহাওয়াতে এ ধরনের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন খুব সহজ নয়। সেই প্রেক্ষিতেই যখন সাহিত্যের জগৎ থেকে আসা মানুষ নরেন্দ্র দেবকে অত আগে, ১৯৩৩-৩৪ সালেই এতটা শ্রদ্ধা এতটা মনোযোগের সঙ্গে চলচ্চিত্রকে বোঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করতে আজ দেখি, তখন তার প্রতি বিশেষ রকম শ্রদ্ধা জাগে। এখনও আমরা অনেকে চলচ্চিত্রকে সস্তা বিনোদনের উপকরণ বলে মনে করি, এর 'শিল্প' বলে বিবেচিত হবার স্পর্ধা রাখা উচিত নয় বলে বিবেচনা করি পানামস পাহাড়ের

চূড়ায় দশম মিউজের আরোহণ সম্ভব নয় বলে মনে করি। কিন্তু চলচ্চিত্রের শিল্প চরিত্র নিয়ে নরেন্দ্র দেব অত আগেই কী বলছেন বা বলতে পারছেন তা তার 'সিনেমা' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে দেখাই :—

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—যা ছবিতে এঁকে বোঝানো যায় না তাকে ছবিতে পরিস্ফুট করে তোলা যাবে কেমন করে? এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন যিনি, চিত্রনাট্য রচনায় সিদ্ধিলাভ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। মানুষ যা কিছু করে তার পিছনে একটা চিন্তা বা যুক্তি থাকেই। ক্যামেরার চোখে তার সে চিন্তা বা যুক্তি ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু তার কাজটা দেখা যায়। তখন তার সেই কাজ দেখে আমরা তার মনের খবর জানতে পারি। অতএব চিত্রনাট্যে পাত্রপাত্রীদের মনোভাবের পরিচয় দিতে হলে রচয়িতাকে নানা ঘটনার (Situation) সমাবেশ করতে হয়—যার মধ্যে তাদের কার্যকলাপ ও অভিনয়-ভঙ্গি (Actors) তাদের **মনোজগতের চিত্রখানিকেও** আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরবে! এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের প্রতিটি কাজের পশ্চাতে কোনো "চিন্তা" বা "যুক্তি" থাকতেই হবে কিনা সেটা অনেক বড় মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক তর্কের ব্যাপার, সে প্রসঙ্গ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্কে অবতারণায় এখানে চলচ্চিত্র চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথমত এখানে চলচ্চিত্র শুধু বাস্তবের উপরিভাগের নকল করে না অন্তর্লোকও উদ্ঘাটন করতে পারে তার একটা সাধারণ স্বীকৃতি আছে, দ্বিতীয় কার্য থেকে কারণে যাবার প্রক্রিয়া 'Sign' বা 'Code' দেখে সেগুলি কিসের sign বা code এই ভাবনার যে বিশিষ্টস্থানটি চলচ্চিত্রে আছে—যা নিয়ে বহু তাত্ত্বিক সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন তার একটা ছোট আভাস এখানে রয়ে গেছে। একটা অতিসাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'পথের পাঁচালী' ছবিতে একটি শটতে দেওয়ালের ফোঁকোরে দুর্গা দাঁড়িয়ে আছে, 'রাজপুত্তুর সাজা' ছোট ভাইটিকে দেখে সে মজা পেয়ে "ও কিরে!" বলে সে হাসে, আমরা তারপর দেখি সেই স্থির শটটিতেই দুর্গার মুখভঙ্গি বদলে যাচ্ছে—গম্ভীর হচ্ছে—তার "রাংতা কোথায় পেলি!" বলার আগেই তার মনের উদ্বেগ (কারণ) তার মুখভাবে (কার্য) রূপ পেয়ে যায়—এটা চলচ্চিত্রের শিল্পত্বের একটা বিশেষ দিক—এই দিকে অত আগেই নরেন্দ্র দেব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন দেখে বোঝা যায় চলচ্চিত্রের প্রতি তিনি কোনো অবজ্ঞা নিয়ে

আলোচনাতে রত হননি। একথা বিশেষ করে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত এই কারণে যে এই সব লেখা তৈরির সময়ে দেবকী বসু, নীতিন বসু বা প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁদের চলচ্চিত্র ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ত্রিশের দশকে তা তখনও শুরুই হয়নি। নরেন্দ্র দেবের বক্তব্য-প্রতিষ্ঠার প্রায় সব উদাহরণই যে কারণে বিদেশী চলচ্চিত্র থেকে নেওয়া। মনে হয় নিজস্ব শিল্পবোধ এবং কিছু অধ্যয়ন (তার ব্যবহৃত পুস্তক তালিকাতে Paul Rotha-র Film Till Now এবং পুসভকিনের Film Technique বইটি রয়েছে) এবং যথার্থ সাহিত্যচেতনা তাকে এইভাবে কনিষ্ঠ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ও মনোযোগী হতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, তার সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি কিছু সৎ সাহস ও স্বাধীন চিন্তারও পরিচয় দিয়েছেন। চলচ্চিত্র ও থিয়েটার-এর অভিনয়রীতির পার্থক্য বিষয়ে বলতে গিয়ে, তিনি দেখাচ্ছেন বিশেষ করে শব্দযুক্ত ছবি (এখানে লক্ষ্য করার মত এই যে বারকয়েক 'সবাক') কথাটা ব্যবহার করলেও তিনি "স্বরোদয়" শব্দটি প্রয়োগ করছেন sound film এর ক্ষেত্রে) চালু করার পর রেকর্ডিং- এর ক্ষেত্রে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অভিনেতা চীৎকার করে কী বিভ্রাট ঘটাতে পারেন তা তিনি 'দেনাপাওনা' ছবির আলোচনায় বলেন (পৃ. ৬৭)। প্রতিষ্ঠিত নটদের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য এখনও আমাদের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করে কেননা আমরা "কিংবদন্তী" ঐতিহ্যে লালিত। এছাড়াও লিখিত নাটক বা উপন্যাসকে চলচ্চিত্র ভাবনায় পুনর্গঠিত করে না নিলে তা যে সার্থক চলচ্চিত্র হয় না একথা তিনি উপালি চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সত্ত্বেও 'নটীর পূজা' ছবি সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় বলছেন, "আবার খ্যাতি ও নামের মোহে ছবির জন্য গল্প নির্বাচন করতে পরিচালকেরা অনেক সময় ভুল করে ফেলেন। এ ভুলের পরিচয় পেয়েছি আমরা সম্প্রতি 'বিচারক' ও 'নটীর পূজা'য়। এই 'বিচারক' ও 'নটীর পূজা'কেও ছবির পর্দায় জয়যুক্ত করে তোলা হয়ত সম্ভবপর হতে পারত যদি এই ছবির পরিচালকেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এগুলির আবশ্যকীয় চিত্ররূপ দিতে বদ্ধপরিকর হতেন। অর্থাৎ ইচ্ছামত অদলবদল করে নিতেন (পৃ. ৭২)। আশির দশকে একজন বিখ্যাত আলোচক আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন 'শেক্সপীয়র' থেকে ছবি করতে গিয়ে বিদেশের চলচ্চিত্রকাররা কিছু বদল করেন না এবং আমাদের ছবি করিয়েরা 'বদল' করেন বলে তাদের তিনি 'তস্কর' বলে গালমন্দ করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে রেখে নরেন্দ্র দেবের মন্তব্যটি দেখলে তার মূল্য সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। অবশ্য নিদর্শন হিসাবে তিনি স্পেনীয়

ঔপন্যাসিক Blasco Ibamz-এর The Four Horsemen of the Apocalypsi-এর কাহিনী নিয়ে হলিউডের চিত্রনাট্যকারের বদলের উদাহরণটি দিয়েছেন তা নিতান্তই হাস্যকর এবং আপত্তিকরও বটে—সেখানে শিল্প চিন্তার কোনো স্থান নেই, আছে কেবল হলিউডি ফর্মুলা মাফিক বাজারি ছবির বদলের নজির। কিন্তু উদাহরণ এখানে বড় কথা নয়, নরেন্দ্র দেবের মনোভঙ্গির পার্থক্যটাই বড় কথা। এই পার্থক্যের চেতনা থেকেই তিনি আরও লিখছেন "বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের একাধিক শ্রেষ্ঠ রচনাই পরের পর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'তে দেখা গেলো, কিন্তু কোনটিই চলচ্চিত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে পারলে না। এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাঁদের কোনো বইখানিরই 'চিত্রনাট্য' চলচ্চিত্রের উপযোগী করে লেখানো হয়নি এবং এ সকল ছবির পরিচালকেরা রঙ্গালয়ের অভিনয়ে নাটক এবং ছায়াচিত্রে অভিনয়ে নাটকের পার্থক্য ও তাহার সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিব্যক্তি স্বীকার করেননি। অথবা সে সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ নন।" সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে বসে এ ধরনের কথা বলতে পারা দুঃসাহসেরই পরিচয় বলে আজ মনে হয়। আরেকটি ব্যাপারেও তাঁর সৎসাহসের কথা উল্লেখ্য। বর্তমানে কি দেশে বা বিদেশে 'পপুলিজম' এর সূত্র ধরে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রকে তাত্ত্বিক সমর্থন দেওয়ার একটা অপচেষ্টা চলেছে। সেখানে রাজকাপুর, চ্যাপলিনকে তুল্যমূল্য করা হচ্ছে। শম্ভু মিত্রের ও অমিত মৈত্রের 'একদিন রাত্রে'কে যে রাজকাপুর নিজের ছবি বলে সারা বিশ্বে চালিয়েছেন তাকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ইংরাজি দৈনিকে '*honest* imitator of Chaplin' বলে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতে ১৯৩৩ সালে বসে কিভাবে হলিউডের বাজার ডলার ছড়িয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর চলচ্চিত্র-প্রতিভাগুলিকে কিনে নিয়ে নষ্ট করছে নির্মমভাবে তার সমালোচনা করেন নরেন্দ্র দেব। তখন তাঁর প্রতি আমার এক বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে। এই প্রসঙ্গেই স্টার সিস্টেম সম্বন্ধে তাঁর কঠিন মন্তব্যগুলোও স্মর্তব্য।

জার্মানি থেকে প্রতিভা কেনার প্রসঙ্গেই দেখা যাচ্ছে জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট্ চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা দুর্বলতা ছিল। সেই সূত্রে তিনি সিনেমার বাস্তব-অতিক্রমণের বিশেষ ক্ষমতার কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে লিখেছেন "ক্যামেরার চক্ষুতে যে কেবল হুবহু বাস্তবের ছায়াটুকুই ধরা পড়ে না, পরিচালকের ইচ্ছামত এই যন্ত্রের চোখও যে স্বপ্ন-ভাবাতুর হয়ে উঠতে পারে, চলচ্চিত্রও যে কঠিন বাস্তবের প্রতিরূপ না হ'য়ে শিল্পীর ধ্যানের মূর্তিও

পরিগ্রহ করতে পারে, সে যে কল্পনার বস্তু এবং শিল্পীর সৃষ্টি বলেও পরিগণিত হ'তে পারে, আলোকচিত্র হ'লে তার প্রাণময় নাটকীয়তা যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং জীবনের বাহ্যিক রূপ ছাড়া মানুষের মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তিও যে চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়, এসব নূতন তত্ত্বের সন্ধান The Cabinet of Doctor caligari' ছবিখানিই চিত্রজগতে সর্বপ্রথম এনে উপস্থিত করেছিল।" এ মন্তব্যের একপেশে দিকটি আমরা এখন উপেক্ষা করতে পারি কিন্তু যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা হলো চলচ্চিত্র শিল্পের অস্তিত্বের অন্তর্লোকে প্রবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে লেখকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। আমরা জানি না তিনি নিজে The cabinet of Doctor Caligari বা আইজেনষ্টাইনের ছবি দেখেছিলেন কিনা। কিন্তু পোটেমকিনের সঙ্গে কেলিগারিকে বিশ্বের দুটি অন্যতম চলচ্চিত্র বলার মধ্যে এবং আইজেনষ্টাইনের অক্টোবর ছবিতে 'জার'-এর মর্মর মূর্তি ভাঙার দৃশ্যাংশটিকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে সে-যুগের একজন বাঙালি সাহিত্য-রসিকের পক্ষে বিশেষ ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। কেলিগরির এক্সপ্রেশনিষ্ট স্থাপত্য এবং বিশেষ করে আলোক সম্পাতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি যেমন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাতে মনে হয় তিনি যদি আরও ব্যাপকভাবে চলচ্চিত্র শিল্প অনুধাবন করতে পারতেন এবং এ-বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে লিখতেন তা'হলে তার কাছ থেকে আমরা চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে রিয়ালিজম্ নন্ রিয়ালিজমের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা পেতাম। চলচ্চিত্রের আদি পর্বের আরেক জন অন্যতম স্রষ্টা আমেরিকার ডি ডব্লুউ গিফিথের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যর মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে।

চলচ্চিত্র শিল্প যে যন্ত্র নির্ভর একথা তিনি শুধু আপ্তবাক্যের মতো ব্যবহার করেননি, সমস্ত বইটি জুড়ে তিনি সেই যান্ত্রিকতার খুঁটিনাটি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা কোনও মৌলিক কাজ না হতে পারে, বিদেশী পুস্তক অধ্যয়নের ফলস্বরূপ হ'তে পারে কিন্তু বাংলা ভাষায় এ ধরনের কাজের জন্য সম্ভবত তাঁকে আমরা পথিকৃতের সম্মান দিতে পারি এবং এমন-কি আর্ট যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় হ'তে চলেছে তখন তাঁর লেখা অনেকগুলি অধ্যায়ই মূল্যবান টেক্সট্ বই হিসাবে পরিগণিত হ'তে পারে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাঁর পরিভাষা সংকলন। অদ্যাবধি আমাদের অভ্যাসে দেখেছি পরিভাষা তৈরি হয় কিন্তু তা ব্যবহার হয় না, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তিনি 'মন্টাজ্'কে করেছেন প্রযুক্তি, 'ফিল্ম সেন্সার'কে করেছেন 'চলচ্চিত্র শাসক' 'fade in' করেছেন 'বিকাশ' 'fade out'

কে 'বিলোপ' বা 'অন্তর্ধান' mid-shop'কে 'অর্ধাংশ ব্যাপক' চিত্র recording'কে 'শব্দ লেখন' 'scenario'কে 'চিত্রনাট্য' বা 'চিত্রগাথা' 'loud speaker'কে করেছেন 'উচ্চবাচক যন্ত্র, 'lissolve'কে বিলয়—সবগুলো যে খুব যথাযথ হয়েছে তা নয়। যেমন 'feature film'কে 'বৈশিষ্ট্যময় চিত্র' বললে আদৌ কিছু বোঝায় না, এই সব পরিভাষা সংকলনে তিনি বিখ্যাত 'বাঙলা' ছবির পরিচালক চারু রায় এবং মনীষী রাজশেখর বসুর উপদেশ ও সাহায্য নিয়েছেন বলে মুখবন্ধে জানিয়েছেন।

পরিশেষে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে হলিউডী সিস্টেমের সমালোচনায় তিনি অতি নির্মম, চলচ্চিত্র-নির্মাণ-বিষয়ক অংশে তিনি কিন্তু সেই হলিউডী সিস্টেম অর্থাৎ 'ষ্টুডিও সিস্টেমে'রই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন এবং পরিচালকের ভূমিকার গুরুত্ব নির্দেশ করা সত্ত্বেও নিজের অজান্তেই 'Author Theory'র সমালোচনা করে ফেলেছেন। সেটা সম্ভবত এই কারণে যে হলিউড চলচ্চিত্রের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বেশি। তাহ'লেও তাঁর এই রচনা আজকের দিনের যে-কোনও চলচ্চিত্র-প্রেমীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

নরেন্দ্র দেব-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনাচক্রে বক্তৃতার অনুলিপি।

B I V A V

Price : Rs. 10·00 | 44th Issue | Reg. No.
Vol. 12. No. 2 | Published in May 89 | R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970—1885

আমরা গড়বো বক্রেশ্বর

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ৩৯ বছর পার হলেও ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং অসম উন্নয়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমা হচ্ছে ক্ষোভ, মাথা তুলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

এই প্রবণতা রুখতে পারে সুষম আঞ্চলিক বিকাশ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের সংকল্পে অবিচল।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এই সংকল্পেরই প্রতীক। সপ্তম যোজনায় অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবু জনগণের রক্তে, ঘামে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কেবলমাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প নয়, এটি পশ্চিমবাংলার মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীক।

সব বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা গড়বো বক্রেশ্বর...

ঃঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঃঃ

আই সি এ ১০৮৪/৮৯